RE-UNION & ANNUAL GENERAL MEETING 2011

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

DU MASS COMMUNICATION & JOURNALISM ALUMNI ASSOCIATION (DUMCJAA)

RE-UNION
&
ANNUAL
GENERAL
MEETING
2011

পুনর্মিলনী
ও
বার্ষিক সাধারণ সভা
২০১১

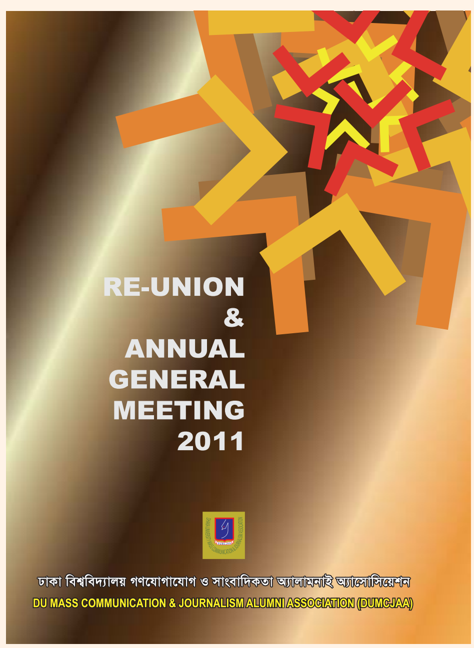

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডিইউএমসিজেএএ)

RE-UNION & ANNUAL GENERAL MEETING 2011

পুনর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১১

প্রকাশকাল
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১

প্রকাশনায়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ
ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম
মো: শামসুল হক

সম্পাদনায়
স্বপন কুমার দাস

সম্পাদনা সহযোগী
মনোরঞ্জন মণ্ডল (মনোজ)
কাজী রওনাক হোসেন
ড. এম কামাল উদ্দীন জসীম
কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন
সুজন মাহমুদ
রাজীব মীর
আহমেদ পিপুল

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

অঙ্গসজ্জা
পাওয়ার প্রিন্ট লিমিটেড
৩১/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা

মুদ্রণ
হাইটেক প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লি:
১৭৩/১ আরামবাগ, ঢাকা

কম্পোজ ও লেআউট
কৃষ্ণ চন্দ্র দাস
মোঃ বিল্লাল হোসেন

যোগাযোগ
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯২০ (এক্স-৬৬২৭, ৬৬২৯)

Re-union & Annual General Meeting 2011

Published
30 September 2011

Published by
Dhaka University Mass Communication and
Journalism Alumni Association

Editorial Advisor
Prof. Dr. Shaikh Abdus Salam
Md. Shamsul Haque

Edited by
Swapan Kumar Das

Editorial Associate
Mano Ranjan Mandal
Quazi Rownaq Hossain
Dr. M Kamal Uddin Jasim
Kazi Moazzem Hossain
Sujon Mahmud
Razib Mir
Ahmed Pipul

Cover
Ashok Karmaker

Design
Power Print Ltd.
31/1 Purana Paltan, Dhaka

Printed by
Highteck Printing and Packaging Ltd.
173/1 Arambag, Dhaka

Compose and layout
Krishno Chandra Das
Md. Billal Hossain

Contact
Mass Communication and Journalism
Alumni Association
Department of Mass Communication and
Journalism University of Dhaka, Bangladesh
Tel: 9661920 (Ext.-6627, 6629)

সূচি

বাণী, সভাপতির নিবেদন, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ৬-২২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (DUMCJAA) গঠনের কথা ২৩
অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম, মো: শামসুল হক

Department of Mass Communication and Journalism at a Glance ২৪
Prof. Dr. Shaikh Abdus Salam

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন ২৬
সাইফুল হক

পাখির চোখে দেখা দেশের ছয় দশক, সমাজ, রাজনীতি, সাংবাদিকতা ২৮
সাখাওয়াত আলী খান

গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম: আন্ত:সম্পর্কের গতিধর্ম ৩৬
রোবায়েত ফেরদৌস

১৬ মিনিট নাটকে ২৫ মিনিট বিজ্ঞাপন এবং বেসরকারি সম্প্রচার নীতিমালা ৩৯
ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ, রফিকুজজামান

ও বন্ধু আমার ৪২
ফকির আলমগীর

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম ৪৪
এম খায়রুল কবীর

নীরবে, নিঃশব্দে চলে গেলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা সাংবাদিক আখতারুজ্জামান ৪৬
মনোরঞ্জন মণ্ডল (মনোজ)

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩: জানা অজানা কথা ৪৮
স্বপন কুমার দাস

এ মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না... ৫১
কাজী রওনাক হোসেন

কৃষি প্রতিবেদন রচনায় প্রযুক্তিজ্ঞান: কতিপয় নমুনা বিশ্লেষণ ৫২
ড. তপন বাগচী

Freedom of Press and Ethics of Journalism ৫৫
Dr. M. Kamal Uddin Jasim

সুশাসনের দুয়ারে তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ ৫৭
মীর মোশারেফ হোসেন (রাজীব মীর)

অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য ৫৯

অ্যাসোসিয়েশনের স্থায়ী ও সাধারণ সদস্য ৬২

পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা পরিষদ ৯৫

অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০১০-১১) ৯৬

বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের কমিটিসমূহ ৯৭

গঠনতন্ত্র ৯৯

আমরা কিছু পারি বা না পারি (কবিতা) ১০২
মীর মাসরুর জামান

ব্রেকিং নিউজ (কবিতা) ১০২
ড. সুধাংশু শেখর রায়

সুধীজনের বাণী

বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
প্রধান বিচারপতি
বাংলাদেশ
সুপ্রীম কোর্ট

বাণী

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আগামী ৩০/০৯/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। আমি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিবারের ন্যায় এবারও একটি মানসম্পন্ন স্মরণিকা প্রকাশ করছে। আমি আশা করি বাংলাদেশের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের লেখনী স্মরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করবে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা আজ সমাজের বিভিন্ন স্থরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা জাতি গঠনে দেশ-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন)

দিলীপ বড়ুয়া
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে যাঁরা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যয়ন করছেন, তাঁদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকবে- এটাই আমাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। সে লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যমী প্রাক্তন শিক্ষার্থী অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। একটি সংগঠন গড়ে তোলা যেমন শ্রমসাধ্য ও অনেক নিষ্ঠার ব্যাপার, তেমনি সংগঠনটির বিকাশ ঘটানো তার চাইতে দুরূহ। এজন্য প্রয়োজন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সকলের আন্তরিকতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদকিতা বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের জন্য গর্ববোধ করি। সতীর্থদের প্রতি আমার আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি আজীবন থাকবে-এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ সংগঠন সাংবাদিকতা, তথ্য, গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি সত্যিকারে দিন বদলের জন্য আধুনিক যোগাযোগ কৌশলের বিকাশ ও তথ্যের ইতিবাচক প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এর কার্যকর অবদান থাকবে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভার সাফল্য কামনা করছি।

(দিলীপ বড়ুয়া)

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

সাংবাদিককতা একটি মহান পেশা। সাংবাদিকগণ অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি, উন্নয়ন বাধা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি তুলে ধরে সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখায়। প্রযুক্তির পরম উৎকর্ষতার এ যুগে গণমাধ্যমকর্মীদের সামনের সারিতে হাঁটতে গিয়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তবে এই বিভাগ শুধু সাংবাদিকই তৈরি করেনি। বিভিন্ন পেশায় জড়িত দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ বিভাগেই লেখাপড়া করছেন। আমি জেনে আনন্দিত প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, শিল্প মন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রমুখ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্য এবং এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র। এছাড়াও দেশের স্বনামধন্য বেশিরভাগ সাংবাদিক এই বিভাগ থেকেই লেখাপড়া করেছেন। সেই সাথে অ্যাসোসিয়েশনের অনেক সদস্য রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে উচ্চপদে আসীন হয়ে যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। সে কারণে তাদের যোগাযোগ মাধ্যম এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নে অ্যাসোসিয়েশনের সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসবেন। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে যেতে পারি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশকে স্বাগত এবং সংশ্লিষ্ট সবার সাফল্য, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামানা করছি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ)

বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর
হাইকোর্ট বিভাগ
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

বাণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এই বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে অনুষ্ঠিতব্য এ আনন্দ মেলায় মিলিত হতে পেরে আমার মধ্যে এক আবেগ মিশ্রিত অনুভূতি কাজ করছে। আজকের এ যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের আবেগকে সমাহিত করে শুধুই বেগকে বাড়িয়ে চলেছে। পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা মানুষকে একাকী করে ক্রমশঃ আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এ ধরণের পুনর্মিলনী ব্যক্তিকে সমষ্টির দিকে ধাবিত করে, আন্তরিকতায় উষ্ণতা সঞ্চার করে; এ জন্যে আমাদের সতীর্থদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের স্বপ্নদ্রষ্টা, উদ্যোক্তা, উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক, সংগঠকসহ সকল সদস্যকে প্রাণঢালা অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা।

যে কোন সংগঠন গড়ে তোলা যেমন শ্রমসাধ্য, তেমনি তাকে টিকিয়ে রেখে যুগোপযোগি করে সামনে এগিয়ে নেওয়া আরও কঠিন। এজন্যে সৎ, দক্ষ, দুরদর্শী, মেধাবী, কর্মঠ ও গতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন। একই সাথে দরকার সকলের আন্তরিক সহযোগিতা। এ সংগঠনের পূর্বাপর কর্মকাণ্ড থেকে প্রতীয়মান হয়, সংগঠনটির নেতৃত্ব কাঙ্খিত যোগ্যতার অধিকারী। যোগাযোগ মাধ্যম পৃথিবীকে অনেক ছোট করে এনেছে। দেশের, এমনকি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এই বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা প্রশংসনীয় অবদান রাখছেন; এছাড়া আমাদের এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেশের উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছেন; আগামিতেও তাঁদের এ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে এটাই আমার প্রত্যাশা। বিচার বিভাগ, দেশের রাজনীতি, শিক্ষা, গনমাধ্যমসহ সকল ক্ষেত্রে এই বিভাগের কৃতি শিক্ষার্থীদের সরব পদচারণা বিশেষ করে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য এই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী হওয়ায় আমাদের আবেগ অনুভূতি এক ভিন্ন উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে শ্রদ্ধা, আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

গোবিন্দচন্দ্র ঠাকুর

(বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর)

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য এবং
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (DUMCJAA)-র ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রীতি সম্মিলন হতে যাচ্ছে।

সতীর্থ, সহপাঠী কিম্বা একই শিক্ষাপরিবারের সদস্যদের সম্মিলন মাত্রই আনন্দের। এমন অভিপ্রেত মিলনমেলা এক অনাবিল ভিন্নমাত্রার অনুভূতির ক্ষণও বৈকি। বিচিত্র অতীত স্মৃতি, ভিন্ন ভিন্ন কাজ এবং নানা পেশার মানুষ হয়েও এ ধরনের প্রীতি আয়োজন 'আমরা সবার মনে সবাই থাকি অনুক্ষণ' এমন এক বিরল এবং স্মৃতিকাতর অনুভূতির বাঁধনে খানিক্ষণ হলেও আমাদেরকে এক জায়গায় যেন বেঁধে ফেলে। আমাদের এ বাঁধন দিন-মাস-বছর পেরিয়ে যুগ এবং কালোত্তীর্ণ। ড. শেখ আবদুস সালাম এবং মোঃ শামসুল হকের নেতৃত্বে আমাদের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এবং একঝাঁক সক্রিয় কর্মী আমাদের সকলকে এই প্লাটফর্মটি তৈরি করে এক শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে গত ৩ বছর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যেভাবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাতে আমি সত্যিই অভিভূত। আমি আমার পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনকাল থেকে যাঁরা ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার সাথে এই সংগঠনটিকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তাঁরা যেমন সবসময় এটিকে ধারণ ও লালন করে যাবেন এবং এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট নতুন নেতৃত্বও সংগঠনকে বিকশিত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন, সে প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রীতি সম্মিলন সফল হোক। আমাদের অ্যাসোসিয়েশন তার গৃহীত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আরও উজ্জ্বলভাবে বেড়ে উঠুক- আজকের দিনে সে কামনাই রইল।

(অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক)

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অধ্যাপক (সুপারনিউম্যারারি)
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
প্রধান উপদেষ্টা, ডিইউএমসিজেএএ

বাণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে নতুন-পুরাতনের মিলন মেলা হতে যাচ্ছে জেনে যেমন আমি আনন্দিত, তেমনি আনন্দিত এই উপলক্ষে প্রকাশিতব্য এই স্মরণিকায় কিছু স্মৃতিচারণের সুযোগ পেয়ে। এই প্রকাশনার উদ্যোক্তারা এটিকে 'বাণী' আখ্যা দিতে চাইলেও এটা মূলতঃ আমার অত্যন্ত আপন এই বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারার গৌরবের অতি সংক্ষিপ্ত এক স্মৃতিচারণ মাত্র।

এই বিভাগের সঙ্গে আমার সম্পৃক্তি এটির একেবারে জন্মলগ্ন থেকে। প্রথমে শিক্ষার্থী ও পরে শিক্ষক হিসেবে। ষাটের দশকের শুরুতে বিভাগে যখন প্রথম ডিপ্লোমা কোর্স চালু হল তখন আমি হলাম প্রথম ব্যাচের ছাত্র, পরে যখন সত্তর দশকের শেষে শুরু হল মাস্টার্স কোর্স তখনও আমি প্রথম ব্যাচেরই ছাত্র। তারপর স্বাধীনতার পর পরই যোগদান করি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে। তখন মোট শিক্ষকই ছিলাম আমরা তিনজন। মাঝখানের বছরগুলিতে আমি ছিলাম পূর্ণকালীন সাংবাদিক। কিন্তু বিভাগের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। সব মিলিয়ে প্রায় অর্ধ শতকের কাহিনী, তার মধ্যে বিভাগেই শিক্ষকতা প্রায় চার দশক। ২০০৮ সালে অবসর গ্রহণের পর আবার দায়িত্ব পেলাম সুপারনিউম্যারারি অধ্যাপক হিসেবে। সেই অধ্যায় এখনও চলছে।

এই বিভাগ আমাকে সাফল্য, সম্মান ও তৃপ্তি দিয়েছে অনেক, আমিই বরং তার যোগ্য প্রতিদান দিতে পারিনি। দু'দফায় বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের সময় সহকর্মীদের সহযোগিতা পেয়েছি অফুরন্ত। প্রথমবার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে রাত্রিকালীন পরিচালিত বিভাগটিকে দিবাকালীন পরিপূর্ণ বিভাগে পরিণত করে এবং বিভাগে অনার্স কোর্স খুলে সব চাইতে বেশি তৃপ্তি পেয়েছি। এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও মুক্তি সংগ্রামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অসাধারণ অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। তেমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চার দশক শিক্ষকতার পর কে না আবেগাপ্লুত গৌরবময় স্মৃতি বহন করবে? আমিও তাই করছি।

সকল প্রবীন ও নবীন সহকর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে বিভাগটিকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান ও জনপ্রিয় বিভাগে পরিণত করতে পেরে বিভাগের বর্তমান সর্বাধিক বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক হিসেবে বিশেষভাবে গৌরব অনুভব করি। বিভাগের অনেক ছাত্র-ছাত্রীই এখন সমাজে উচ্চ মর্যাদায় আসীন। কেউ কেউ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে শিখরে পৌঁছেছেন। এই বিভাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্ব ছাড়াও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনেক নারী-পুরুষ প্রতিভাবান কর্মী জাতিকে উপহার দিয়েছে।

বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়ে এখনো পথ চলছি। তবে বিভাগের অনেকে ইতোমধ্যে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তাদের আমরা বেদনা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ও তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

নবীন-প্রবীনের মেলবন্ধন রচনার এই উদ্যোগ নিয়ে বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রমাণ করেছে যে, আসলেই তারা গণযোগাযোগের শিক্ষার্থী। অধ্যাপক শেখ আবদুস সালামের নেতৃত্বে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠকদের আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সাখাওয়াত আলী খান

(ড. সাখাওয়াত আলী খান)

RE-UNION
&
ANNUAL
GENERAL
MEETING
2011

আবু আলম মোঃ শহিদ খান

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন শিার্থীদের সম্মিলিত উদ্যোগে গঠিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। আমি আরও আনন্দিত যে, এ উপলক্ষে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তথ্যপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ বিভাগসমূহের অন্যতম। এই বিভাগের পাঠ্যক্রম শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের জন্য হাতে-কলমে শেখার অনেক সুযোগ করে দেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী। এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা সাংবাদিকতাই নয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অবদান প্রশংসার দাবি রাখে। অ্যাসোসিয়েশনের অনেক সদস্য রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে উচ্চপদে আসীন হয়ে যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন এবং দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। একই সঙ্গে তারা গণমাধ্যমে যথাযথ ভূমিকা রেখে দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাচ্ছেন। আমি তাদের প্রশংসা করার পাশাপাশি এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি যে, তারা বিশ্ব অঙ্গনে বাংলাদেশের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষে জাতি গঠনে এগিয়ে আসবেন।

তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বিশ্ব অনেক ছোট হয়ে এসেছে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা জাতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সোনার বাংলা গড়তে এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এটাই বাঙালি জাতির প্রত্যাশা।

আমি অ্যালমনাই অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। যারা মেধা, শ্রম, সময় ও দক্ষতা দিয়ে এ সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

(আবু আলম মোঃ শহিদ খান)

মুহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, এনডিসি
আই জি প্রিজন্স (অব:)
সদস্য
বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

বাণী

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিভাগটি ১৯৬২ খ্রীস্টব্দে প্রতিষ্ঠা লাভের পর বিগত প্রায় ৫ দশক যাবত এ বিভাগ হতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ ভূমিকা-অবদান রেখে আসছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বেশ কয়েকজন ছাত্র সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বীরত্বের পরিচয় রেখেছেন। গৌরবময় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য প্রখ্যাত ছাত্রনেতা জনাব নূর এ আলম সিদ্দিকী এ বিভাগের ছাত্র ছিলেন। বর্তমান সরকারের মন্ত্রীপরিষদে রয়েছেন দু'জন সদস্য। দু'টি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানেও রয়েছেন দু'জন প্রাক্তন কৃতি ছাত্র। এছাড়া শিক্ষা বিভাগসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উর্দ্ধতন পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছেন বেশ ক'জন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। দেশের প্রিন্ট (Print) এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া (Electronic Media) গুলোতে এ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ২০০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভের পর হতে নিয়মিত প্রতিবছর এ ধরণের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এতে এ বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন ও পরস্পরের সাথে পরিচয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ প্রয়াস অব্যাহত থাকুক-অ্যালামনাই অ্যাসোশিয়েশনের কর্মকর্তাদের নিকট এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০১১ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মুহাম্মদ লিয়াকত আলী খান)

RE-UNION
&
ANNUAL
GENERAL
MEETING
2011

এ কে এম আমির হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক নতুন ও পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের মধ্যে সেতু বন্ধনের লক্ষ্যে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্মরণিকা প্রকাশের প্রয়াসকে আমি স্বাগত ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত এশিয়া মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে স্থাপিত হবার পর থেকে এ বিদ্যাপীঠ থেকে অসংখ্য জ্ঞানী, গুণী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী দেশে-বিদেশে দেশ ও মানব জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের বদৌলতে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ বিভাগের সুযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। আজকের দিনে মিডিয়ার যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা এসেছে এ বিভাগের হাত ধরেই। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ বিভাগ সৃষ্টি না হলে এবং এ বিভাগের যশস্বী কৃতি ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অসীম ত্যাগ-তিতীক্ষার পরিচয় না দিলে হয়তোবা আজকে দেশে সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার মুখ এত উজ্জ্বল হতো না। এ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ দেশ-বিদেশে স্ব-স্ব- ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ জন্য এ বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের ধন্যবাদ প্রাপ্য। আজকের এ দিনে আমি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রয়াত জনাব আতিকুজ্জামান খান এবং জনাব কিউ এ আই এম নুরুদ্দিন স্যারকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। এ পটভূমিতে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিতব্য স্মরণিকার মাধ্যমে নতুন-পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের মাঝে পরিচিতি এবং যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশ ও জাতি গঠনে এবং জাতির সমৃদ্ধি অর্জনে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার গুরুত্ব দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

অ্যালামনাই এসোসিয়েশণের উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হোক এ কামনা করছি।

(এ কে এম আমির হোসেন)

চৌধুরী ইখতিয়ার মমিন
রাষ্ট্রদূত, স্পেন

বাণী

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সার্বিক অগ্রগতির জন্য গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা তথা গণমাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তির অবদান অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি চোখে পড়ার মত। এই এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে সে গৌরবের অংশীদার হতেও ভাল লাগছে। এই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় উদ্যোগে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ২০১১-র এই আয়োজনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ সংগঠনের সাথে সংশিষ্ট সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। অ্যাসোসিয়েশনের প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও গতিশীল নেতত্বে এবং যাঁদের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা, শ্রম, মেধা ও নিরলস প্রচেষ্টায় এই সংগঠনের জন্ম ও এগিয়ে চলার ধারা অব্যাহত রয়েছে সে সব সংগঠক ও স্বপ্নদেখা মানুষগুলোকে আজকের এই শুভক্ষণে আমার পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘজীবি হোক।

(চৌধুরী ইখতিয়ার মমিন)

গীতি আরা নাসরীন, পিএইচডি
অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

গর্ব করে বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের জন্য 'যোগাযোগ' শুধু অধ্যয়নের বিষয় নয়, প্রয়োগেরও বটে। সময়ের সাথে-সাথে পরিবর্তনশীল তথ্য ও প্রযুক্তিতে এই বিভাগের পাঠক্রম এবং পদ্ধতিতে ক্রমাগত যেমন আধুনিকায়ন ঘটেছে; তেমনি যোগাযোগের যোগসূত্র তাই এ বিভাগের সদস্যদের গেঁথে রেখেছে সেই ১৯৬২ সাল অর্থাৎ বিভাগের জন্মের পর থেকেই এর ঐতিহ্যের সাথে।

সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স দিয়ে যে বিভাগের জন্ম, প্রায় অর্ধশতাব্দী ছুঁয়ে সে বিভাগে এখন চার-বৎসরের স্নাতক-সম্মান, একবৎসর ও দু'বৎসর মেয়াদী দু'টি স্নাতকোত্তর কর্মসূচি রয়েছে। যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা মূলতঃ নানামুখী জ্ঞানের সম্মিলন। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরাও তাই শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে নিজেদের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতের বিশাল পরিমণ্ডলে যেমন তারা বিভিন্ন নক্ষত্র; তেমনি আবার উন্নয়ন কর্মে, বা জনসংযোগে তারা মাটি ও মানুষের কাছাকাছি। বিজ্ঞাপন, বিপণন, প্রকাশনার মতো গণযোগাযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন তারা সম্মিলিত শ্রমে সফল উদ্যোগ নিতে পারেন; আবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বত্র সুযোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারেন অবলীলায়।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার শিক্ষা এমনই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরুলেই সে শিক্ষা শেষ হয়ে যায় না। কিম্বা যোগাযোগের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায় না। সেই বোধ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বোধন। অগ্রজরা যেখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছেন অনুজদের দিকে। অনুজেরা অনুসারী অগ্রজের। যোগাযোগে মিলেমিশে পদচারণা করছেন একত্রে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশনের সমবেত প্রচেষ্টা অটুট থাকুক। অসাধারণ চিন্তার প্রকাশ ঘটুক তাদের সাধারণসভায়, পুনর্মিলনে প্রবাহমান হোক যোগাযোগধারা।

(গীতি আরা নাসরীন)

নাঈমুল ইসলাম খান
সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক আমাদের সময়

বাণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এ বছর পূনর্মিলনী ও সাধারণ সভার আয়োজন করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও আমি আন্তরিক আগ্রহে অপেক্ষা করছি। উক্ত অনুষ্ঠানে থাকবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, আয়োজন করা হবে র‌্যালি ও মতবিনিময় সভা এবং প্রকাশ করা হবে একটি স্মরণিকা। এসবই উল্লেখযোগ্য ও সুখের কথা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে এত বছর ধরে যারা পড়াশোনা করেছেন, ডিগ্রী নিয়েছেন তারা সকলেই বিভাগের পরিবেশে ও শিক্ষায় হয়ে উঠেছিলেন একেকজন চৌকষ নাগরিক। এই শিক্ষিত ও চৌকষ মানুষেরা আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বয়স ও যোগ্যতানুপাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম এবং জনসংযোগ পেশাসহ বিচিত্র সব অঙ্গনে সাংবাদিকতার প্রাক্তন ছাত্রদের সফল বিচরণ সত্যিই আনন্দ ও গর্বের। অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অনেকের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ ও স্মৃতিচারণের সুখ পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে আমার ছাত্রত্বের সময়, কর্মজীবনের জন্য নিজেকে যোগ্য ও প্রস্তুত করে তোলার আনন্দমুখর শ্রেষ্ঠ সময়। আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমাদের প্রয়াত সকল শিক্ষক এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভাগের প্রয়াত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদেরও।

আমি পূনর্মিলনী ও সাধারণ সভার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

নাঈমুল ইসলাম খান

RE-UNION & ANNUAL GENERAL MEETING 2011

রকীবউদ্দীন আহমেদ
মহাসচিব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

বাণী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ডিইউএমসিজেএএ)-এর তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যারপরনাই আনন্দিত।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বর্তমানে যারা নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তাদের অধিকাংশই হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের কৃতি প্রাক্তন ছাত্র। সে সুবাদে এদের সকলেই ডিইউএমসিজেএএ-এর সদস্য। শুধু তাই না-বাংলাদেশে বর্তমান বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং কূটনৈতিক পেশাসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি পেশায় এই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আরো গৌরবের বিষয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় সামগ্রিক উন্নয়নে ভবিষ্যতে আরও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক আরোফিন সিদ্দিকসহ সাংবাদিকতা বিভাগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাক্তন কৃতি ছাত্র ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের জীবন সদস্য। তাঁদের সম্পৃক্ততা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনকে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন করেছে।

উল্লেখ্য যে, ১ জুলাই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার জয়যাত্রা শুরু করে, এরই ধারাবাহিকতায় প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের নিয়ে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। অত্যন্ত গর্বের সাথে আমরা স্মরণ করি যে, তিরিশ দশক থেকেই এদেশে যা কিছু কল্যাণকর এবং যা কিছু নিয়ে আমরা জাতি হিসেবে আজ গর্ববোধ করি তার প্রায় সবটুকুতেই রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের র্স্পশ। আমার জানা মতে বিশ্বে এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিদ্যাপীঠ নেই যার ছাত্ররা সেই দেশের স্বাধীনতা অর্জনে কিংবা মাতৃভাষা অথবা বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। যার দাবিদার একমাত্র আমাদের প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠ "সৌরভে গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়"।

আমরা সবাই জানি যে, বিশ্বের সব দেশে অ্যালামনাই'রা তাঁদের প্রিয় বিদ্যাপীঠের শিক্ষা ও গবেষণামূলক কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও অগ্রণী ভূমিকা রাখে অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে এবং গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে। তাই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গেলেও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মধ্য দিয়ে তাঁদের মাতৃরূপ বিদ্যালয়ের সঙ্গে নাড়ির যোগ বজায় রাখে ও স্বউদ্যোগে এগিয়ে আসে দায়বদ্ধতা পরিশোধে।

তাই আমরা নিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দেশে-বিদেশে ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যাঁর যাঁর প্রতিষ্ঠিত অবস্থান থেকে আমাদের অ্যালামনাইগণও একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠের জন্য ভালো কিছু করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। জেনে রাখুন, আমরা আছি আপনাদের পাশে। আমরা আপনাদের নিয়ে গর্বিত।

আমি অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(রকীবউদ্দীন আহমেদ)

সভাপতির নিবেদন

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম

২০০৮ সালে মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়ায় বিভাগের প্রাক্তন-বর্তমান শিক্ষার্থীদের নিয়ে পিকনিক এবং পিকনিক থেকে নেয়া সিদ্ধান্ত ও পরামর্শের ধারাবাহিকতায় ৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখ টিএসসি-তে অনুষ্ঠিত সম্মিলনের মাধ্যমে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশন গঠনের আগে পরে আমরা আমাদের বিভাগের অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং গুণী সতীর্থদের হারিয়েছি। তাঁদের মধ্যে জনাব অতিকুজ্জামান খান অধ্যাপক কিউ এ আই এম নুরুদ্দিন, অধ্যাপক তৌহিদুল আনোয়ার, অধ্যাপক সিতারা পারভীন, জনাব মহিউদ্দিন হিরু, সম্প্রতি প্রয়াত জনাব মিশুক মুনীর, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আখতারুজ্জামান প্রমুখের চলে যাওয়ায় আমরা গভীরভাবে ব্যথিত। এছাড়াও আমরা জানি না এমন যারা প্রয়াত হয়েছেন আমি তাঁদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করছি। অ্যাসোসিয়েশনের জন্মের পর থেকে ইতোমধ্যে আমরা তিন বছর পার করে ফেলেছি। আজ আমাদের তৃতীয় সাধারণ সম্মিলন ও পুনর্মিলনী। আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন-কে। আজকে এই সম্মিলনে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বিচারপতি, দুদক কমিশনার, সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সম্পাদক, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও দেশ-বিদেশের নানা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আমাদের বিভাগের উজ্জ্বল মুখগুলো। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা সবাই আলোকিত এবং কৃতি মানুষ। আমি আজকের এই মিলনমেলায় উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের প্রিয় সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট সাল তারিখ উল্লেখ থাকলেও প্রকৃত বিবেচনায় অ্যালামনাই গঠনের উদ্যোগ এবং প্রচেষ্ঠা ছিল বহু আগে থেকে, যা' সংক্ষিপ্তাকারে এই প্রকাশনার ডিইউএমসিজে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কথায় উল্লেখ রয়েছে। যাঁদের শ্রম, ত্যাগ, উদ্যোগের ফলে আমরা আজ একত্রিত হতে পেরেছি তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত আমাদের এই বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার গ্রাজুয়েট বেরিয়েছেন - তাঁদের অনেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে অবস্থান করছেন। সরকারের মন্ত্রী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তাব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা, গণমাধ্যমের শীর্ষ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে অবস্থানসহ বিভিন্ন পরিমণ্ডলে আমাদের গ্রাজুয়েটদের পদচারণা আমাদের মধ্যে ভিন্ন এক অনুভূতির জন্ম দেয়। বিশেষ করে আমাদের অ্যালামনাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ণধার হওয়ায় আমাদের গর্ব এবং বিভাগের গৌরব আজ অনন্য এক মাত্রা পেয়েছে। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে তাঁকে এবং অন্যান্যদের আমরা অভিনন্দিত করছি।

আপনারা আমাকে এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পর পর দু'বার সভাপতি নির্বাচিত করে এর গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন। গত দুই/তিন বছরে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার, বই প্রকাশনা অনুষ্ঠান, পিকনিক, একাধিক সদস্যের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি নানা কর্মসূচি এবং উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগে আপনাদের আন্তরিক ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল আমাদের চলার পথের মূল শক্তি। আমাদের সাধারণ সম্পাদক তাঁর রিপোর্টে এসবের সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। আমি এসব কাজের সাথে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন আমার পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব কতটুকু সম্পন্ন করতে পেরেছি তা' জানি না। তবে অ্যাসোসিয়েশনকে এগিয়ে নিতে সবচেয়ে কম শ্রম যার-সে ব্যাক্তি আমি। আমাদের সংগঠনের আজকের এই অবস্থান এবং এর গতিশীল প্রবাহ সৃষ্টির মূল কারিগর আপনারা। অ্যাসোসিয়েশনের চলার পথে সংগঠিত ছোট-বড় সকল ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে না পারার দায় আমার। আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে অ্যাসোসিয়েশনের সকল সাধারণ সদস্য, আমাদের নিবেদিত এবং সফল সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ শাসসুল হকের নেতৃত্বে ক্রিয়াশীল নির্বাহী কমিটি, পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ, উপদেষ্টা পরিষদ, শুভার্থী-শুভানুধ্যায়ী, আজকের আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীবৃন্দ বিশেষ করে বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি উচ্চারণ করতে চাই। তা হচ্ছে 'জগতে যোগ্য মানুষ আছে, কিন্তু তাঁকে দেখানোর যোগ্য মঞ্চ নেই।' আমরা সংগঠিত হয়েছি -আমরা মঞ্চ তৈরি করেছি আমাদের যোগ্য মানুষগুলোকে একত্রিত করে তুলে ধরার জন্য। আসুন আমরা এই মঞ্চের সদস্য হয়ে আরও বিকশিত হই এবং নৈকট্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আরও উজ্জ্বল হই। এখন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পালা। এই পথযাত্রায় হয়তো অনেক বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। তবুও আমরা হাতে হাত ধরে সামনে এগিয়ে যাবই - এই হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার। সকলের আলোকোজ্জ্বল কর্মজীবন, সুস্বাস্থ্য, নিরাপদ পথচলা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

মোঃ শামসুল হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন সতীর্থদের নিয়ে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা ৯ আগস্ট ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৬ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ডিইউএমসিজে অ্যালামনাই অ্যাসেসিয়েশনের ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

গত ১৬ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনী ও বার্ষিক সাধারণ সভায় অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১১টি সভায় মিলিত হয়ে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি।

১. গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করার লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।

২. প্রতি দুই মাস অন্তর মাসের প্রথম শনিবার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একই সাথে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সভা অনুষ্ঠানের পর পরবর্তী সভায় পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অবহিত করে যথারীতি তা অনুমোদন করা হয়। তাছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ফরম নতুনভাবে (ইংরেজিতে নাম অন্তর্ভুক্তসহ) ছাপানো হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক রেজিস্ট্রেশন এবং জরুরি ভিত্তিতে নিজস্ব কার্যালয়ের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত থাকলেও তা বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৩. আমাদের সদস্যদের মধ্যে কেউ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলে কিংবা কোন উল্লেখযোগ্য অর্জন থাকলে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পত্র মারফত তাঁদের অভিনন্দন জানানো হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্পেনের মহামান্য রাজা কর্তৃক "কমান্ডার অব দ্য অর্ডার অব মেরিট" পদক প্রাপ্তিতে এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থী মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায়, অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মোঃ লিয়াকত আলী খান সরকারী কর্ম কমিশন (পিএসসি) এর সদস্য হিসেবে, আবু আলম মোঃ শহিদ খান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও এ কে এম আমির হোসেন অতিরিক্ত সচিব নিযুক্ত হওয়ায় এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব মনোয়ার হোসেন অর্থনৈতিক রিপোর্টার ফোরামের সভাপতি নিযুক্ত হওয়ায় তাঁদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৪. সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য জনাব আনিসুর রহমান এর চিকিৎসার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হতে নগদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে ভারতের দিল্লীতে তাঁর চিকিৎসা চলছে। তাঁর চিকিৎসা বাবদ আমাদের সদস্যগণ, বিভিন্ন সংগঠন, ব্যাংক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত টাকাসহ মোট প্রায় ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা সংগ্রহ করে আমাদের একজন অ্যালামনাইসহ তাকে ভারতে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং সভাপতি ড. শেখ আবদুস সালাম, অ্যালমনাই রোবায়েত ফেরদৌস, আরিফা এস সারমিন, মুনিমা সুলতানা, রুহুল গণি জ্যোতি, শাহরিয়ার শহিদ এবং ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, রমনা, কৃষ্ণ পদ রায় যে পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমি সকলকেই তাঁদের এ মহৎ উদ্যোগের জন্য অভিনন্দন জানাই। এছাড়াও প্রবীন সাংবাদিক এবং বিভাগের এক সময়ের খণ্ড কালীন শিক্ষক জনাব খন্দকার আলী আশরাফকে এক কালীন সাহায্য করা হয়েছে। বিভাগের মেধাবী ছাত্র সাইফুল সামিন ২০ জুন ২০০৮ তারিখে সাংবাদিকতার এ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে ট্রেনের নিচে কাঁটা পড়ে দু'টি পা হারিয়েছে। আজ সে আমাদের সকলের সহযোগিতায় কৃত্রিম পা নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত থেকে প্রমাণ করেছে মানুষ মানুষের জন্য।

৫. “বিটিভির খবর প্রাইভেট চ্যানেলে আমাদের ভাবনা”, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও গৌরবের ৮৯ বছর: অতীত ও বর্তমান বাস্তবতা”, “স্থানীয় সরকার নির্বাচন: গণপ্রত্যাশা ও গণমাধ্যম”, প্রথম আলো কার্যালয়ে ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে “বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার-এর স্বায়ত্তশাসন: অপেক্ষার শেষ কবে” বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক হয় এবং প্রথম আলো ৬ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করায় প্রথম আলোকে ধন্যবাদ। আমরা আয়োজন করেছি “নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও আমাদের গণমাধ্যম” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক। সেখানে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভাপতি ড: শেখ আবদুস সালাম কর্তৃক প্রণীত “বাংলাদেশ গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় আলোকিতজনেরা” গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এসব সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠকে আমাদের সদস্য, বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসনীয়। তাছাড়া এ সময়ের মধ্যে আমরা দুটি বার্ষিক পিকনিক ও নৌবিহারের আয়োজন করেছি।

এ সব কর্মসুচি, পিকনিক, সাংস্কৃতিক ইভেন্টসমূহ আয়োজনে আপনাদের সকলেরই কম-বেশি অংশগ্রহণ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করতে চাই। এরা হলেন জনাব মনোয়ার হোসেন, আলমগীর হোসেন, এম খায়রুল কবীর, মিসেস শাহিদা আলম, স্বপন কুমার দাস, কাজী রওনক হোসেন, মনোরঞ্জন মণ্ডল (মনোজ), কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন, সুজন মাহমুদ, তারিকুল ইসলাম রবিন, মুন্সী শামসুদ্দিন আহমেদ লিটন, ড. এম কামাল উদ্দীন জসিম, রোবায়েত ফেরদৌস, আহমেদ পিপুল, সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, রাজীব মীর, সাইফুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন এবং মাজেদুল হাসান পায়েল ও নাজমুলসহ আরও অনেকেই।

আমরা সম্প্রতি হারিয়েছি শহীদ মুনির চৌধুরীর ছেলে সাবেক শিক্ষক মিশুক মুনির ও চলচিত্র ব্যক্তিত্ব তারেক মাসুদ-কে। তাঁদেরকে সড়ক দূর্ঘটনায় হারিয়ে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম এবং চিত্রজগৎ এর যে ক্ষতি হয়েছে তা হয়তো পূরণযোগ্য নয়।

৬. প্রিয় সদস্যবৃন্দ, আমরা গত বছরগুলোতে আমাদের গঠনতন্ত্রের আলোকেই সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। আমাদের অভিজ্ঞতায় বিবেচিত হয়েছে যে, প্রতি মাস বা প্রতি বছরে সদস্যগণের চাঁদা না নিয়ে সকলকে এককালীন ১৫০০/ টাকা প্রদান করে স্থায়ী সদস্য হলে অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সেমতে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল সাধারণ সদস্যের জন্য ১৫০০/ (পনের শত) টাকা চাঁদা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিষয়টি স্মারণিকায় প্রকাশিত গঠনতন্ত্রের ৮ ধারায় প্রস্তাবাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। গঠনতন্ত্র ৯ ও ১০ এবং ১২ ধারায়ও সামান্য সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। আপনাদের সম্মতি পেলে এই সভায় তা অনুমোদিত হবে।

৭. অ্যাসোসিয়েশনের গত দু’বছরের কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ফলে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে। একই সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-কে। যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও অ্যাসোসিয়েশনের সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান এবং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালামের নিকট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনে আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ।

আমাদের এ চলারপথে অন্যান্য সম্মানিত উপদেষ্টাবৃন্দ এবং সম্মানিত পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করায় আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সংগঠনের শুরু থেকে দীর্ঘ তিন বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে যে ব্যর্থতা আছে তার সবটুকুই আমার। আজ সংগঠন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এটা হয়ত আমাদের স্বার্থকতা। নতুন নেতৃত্ব ভবিষ্যতে এ সংগঠনের প্রদীপ হাতে নিয়ে যোগ্য নেতৃত্ব দিবে এটাই আমার প্রত্যশা। আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে স্মরণিকায় যদি কোন ভাই-বোনের পরিচিতি স্থান না পায় কিংবা পরিচিতিতে কোন ক্রুটি থাকলে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। এ ধরনের ক্রুটি আমাদের নজরে আনলে আমরা তা সংশোধন করবো।

স্মরণিকা প্রকাশে বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, সদস্য-সচিব ও সদস্যগণ রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করায় আমি তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ।

পরিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনীর সফলতা কামনা করছি। অনুষ্ঠান আয়োজনে যাঁরা আর্থিক সহযোগিতা, সুচিন্তিত পরামর্শ ও শ্রম প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অ্যাসেসিয়েশনের সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

মো: শামসুল হক (সাবেক জেলা ও দায়রা জজ), সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

সম্পাদকীয়

গত স্মরণিকা প্রকাশের সময় সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলেছিলাম, 'আমরাও পারি।' এটি ছিল আমাদের প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের রসায়ন। আমরা স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সামর্থের জানান দিয়েছিলাম। সে সামর্থের সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু ঐকান্তিকতার কোন ঘাটতি ছিল না। আমরা আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পেরেছি। এটি নিছক আবেগ তাড়িত উচ্চারণ ছিল না; ছিল অঙ্গীকার পূরণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা-সেটির সত্যাসত্য কাজের ভিতর দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে। আবার আমাদের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে স্মরণিকা প্রকাশের। এ গুরু দায়িত্ব পালনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। গতবার যেটা ছিল প্রত্যাশা এবার তা হয়ে দাঁড়িয়েছে দায়বোধে উদ্দীপিত। সুতরাং এ দায়িত্ব পালনের জন্য দায় এবার অনেক বেশি।

এ স্মরণিকা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের স্মরণিকা নয়, এটি সাংবাদিকতা বিভাগসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটি স্মরণিকা। এর আগে আমরা বলেছিলাম, আজ যে চারা গাছ রোপণ করা হল সেটিই একদিন ফুলে ফলে বিস্তৃত হবে। আমাদের সেই আশাবাদকে সামনে রেখেই দ্বিতীয় বারের মতো আমরা স্মরণিকা প্রকাশে সাহসী হয়েছি–এর ক্রম প্রকাশনার মাঝ দিয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য সংস্কৃতি, লড়াই সংগ্রাম আত্মত্যাগের সুবিশাল পটভূমিকে ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। শুধু ধারণই নয় একে লালন করতে চাই, এই আদর্শের উৎকর্ষ সাধন করে তা ছড়িয়ে দিতে চাই সর্বত্র, জানিয়ে দিতে চাই সবাইকে। আমাদের অতীত গৌরবকে অবলম্বন করে বর্তমানকে কাজে লাগিয়ে আগামীর সোনালী দিনগুলোকে আয়ত্বে নিতে চাই। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এর চেয়ে বড় উপহার আর কী হতে পারে।

এক সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো বাসন্তিকা। যেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'তোমাদের এই হাসি খেলায় আমি যে গান গেয়েছিলাম, এই কথাটি মনে রেখ।' রবীন্দ্র নাথের সে মনোবাসনা অপূর্ণ থাকেনি। আজকের বাংলাদেশের সর্বত্রই কবিগুরুর অস্তিত্বের উপস্থিতি। বাসন্তিকার যোগ্যতা অর্জনের ধৃষ্টতা আমাদের নেই, কিন্তু বাসন্তিকার উত্তরসুরী হতে দোষ কোথায়? এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রেই। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তার আলাদা ঔজ্জ্বল্য। বাংলাদেশের শিক্ষা, শিক্ষার সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ভাষার লড়াই, গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সর্বক্ষেত্রেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনন্য। আর তাই আমাদের এ সকল কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মও হয়েছে দীর্ঘ লড়াই শেষে বিজয় অর্জনের স্মারক হিসেবে।

আমাদের এ স্মরণিকাকে একটি স্মারকগ্রন্থ হিসেবেই প্রকাশ করতে চাই–যেখানে উৎকীর্ণ থাকবে সোনালী অতীত, বর্ণালী বর্তমান আর অপার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের গন্তব্য নির্দেশনা। ইতিপূর্বে আমাদের স্মরণিকা বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গবেষক এখানে গবেষণার বিষয়বস্তু খুঁজে পাবেন, সাহত্যরসিক পাবেন সাহিত্যরসাস্বাদনের সুযোগ, ইতিহাসবিদ ইতিহাসের উপাদান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার দর্শন, বিজ্ঞান, উপযোগ এবং সেই সাথে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক খুঁজে পাবেন তাঁর অনেক জিজ্ঞাসার জবাব।

আমাদের এই স্মরণিকা আলোর মুখ দেখতে পাওয়ার নেপথ্যে রয়েছে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, বহুমাত্রিক সহযোগিতা। একাজে আমাদেরকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাত্রায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কেউবা লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, কেউ বিজ্ঞাপন দিয়ে, কেউবা বিজ্ঞাপন সংগ্রহকরে, কেউবা উৎসাহ দিয়ে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিতে শক্তি যুগিয়েছে। আর আমাদের এই সংগঠনের সাথে সংযুক্ত না থেকেও কম্পোজ, প্রুফ, অলঙ্করণ, প্রচ্ছদ, ছাপা এবং বাঁধাইয়ের কাজে যারা সহায়তা করেছে শুধু যে অর্থের বিনিময়ে করেছে এমনটি নয়। তাদের আন্তরিক শ্রম আমাদের অনেক কাজকে সহজ করে দিয়েছে। বিভিন্ন জনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়তার ফসল এ স্মরণিকা।

পরিশেষে বলতে চাই, কালের যত্রাপথে আমাদের এ মিলন মেলায় উজ্জীবিত হোক সকল হৃদয়, উন্মুক্ত হোক সকলের তরে। যেন হাত ধরাধরি করে পার হতে পারি বাধার বিন্ধ্যাচল। জাতীয় কবির ভাষায়, 'শুভ যাত্রার লগনে কালের শঙ্খ বাজিছে ওই; কে দেখাবে পথ, প্রদীপ তুলিয়া নিশীথ রাতের বন্ধু কই'?

স্বপন কুমার দাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (DUMCJAA) গঠনের কথা

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম
মো: শামসুল হক

বলা যায় সেই ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে আমরা যখন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী তখনই মাঝে মধ্যে গুঞ্জন শোনা যেত যে, আমাদের বিভাগের একটা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন থাকা দরকার। সে সময় বিভাগে 'গণযোগাযোগ ক্লাব' নামে একটি সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। মাঝে মধ্যে দু'একটি অনুষ্ঠান-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতো। একটু তোড়জোড় করে একসময় সংবাদ সংস্থা ইউ. এন. বি প্রতিষ্ঠার পর পরই এর কর্ণধার (বিভাগের শিক্ষার্থী এবং স্বল্প সময়ের শিক্ষক) জনাব এনায়েত উল্লাহ খান হোটেল পূর্বাণী এবং হোটেল শেরাটনে দু'একবার অনুষ্ঠান এবং নৈশভোজের আয়োজন করেন। বিভাগের শিক্ষক, সিনিয়র শিক্ষার্থী এবং বেশ কিছু পুরাতন ছাত্র-ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অধ্যাপক কিউ এ আই এম নূরুদ্দিন অনুষ্ঠানগুলোতে সভাপতিত্ব করেন। এসব অনুষ্ঠানে জনাব এনায়েত উল্লাহ খানকে প্রধান উদ্যোগী করে বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই উদ্যোগ ওই পর্যন্তই।

বহু বছর পর আর এটা নিয়ে তোড়জোড় শোনা যায়নি। ২০০০ সালে অধ্যাপক কিউ এ আই এম নুরুদ্দিন বিভাগ থেকে অবসরে যান। বিভাগের বর্তমান-পুরাতন শিক্ষার্থীরা মিলে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে তাঁকে এক বিশাল সংবর্ধনা প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একক কোনো শিক্ষকের বিদায়ে এত বড় অনুষ্ঠান আমাদের চোখে পড়েনি। এই অনুষ্ঠান থেকে আবারও তাগিদ উঠে বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের। অধ্যাপক ড. গোলাম রহমানের নেতৃত্বে ২০০৪-২০০৫ সালের দিকে এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সভা হয়। এ সময় মোটামুটি একটা কার্যকর উদ্যোগের চেষ্টা নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাও বাস্তবতা পেতে পারেনি।

২০০৬ সালে ড. সালাম বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেয়ার পর বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক এবং প্রাক্তন দু'চারজন শিক্ষার্থীদের থেকে দু'এক সময় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কথা বলা হয়। তখন থেকে ভাবনা শুরু হয়- কীভাবে এটা করা যায়। ২০০৮ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে বিভাগের কিছু শিক্ষার্থী বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে ড. সালামের কাছে একটি পিকনিক আয়োজন করার প্রস্তাব নিয়ে আসে। এই উদ্যোগের সাথে বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মফিজুর রহমান, জনাব রোবায়েত ফেরদৌস, মাস্টার্স পরীক্ষার্থী আহমেদ পিপুল, প্রাক্তন ছাত্র কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখের সংযুক্তি ঘটে। তখন সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত হয় পিকনিকটা বর্তমান এবং পুরাতন শিক্ষার্থীদের নিয়ে বড় আকারে আয়োজন করে সেখানে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের বিষয়টি আনলে কেমন হয়? তখন সবাই একমত হয়ে আরও দু'জন উদ্যোগী প্রাক্তন ছাত্র জনাব মো: শামসুল হক এবং মি: স্বপন কুমার দাসকে এই উদ্যোগের সাথে যুক্ত করা হয়। এভাবে ২১ মার্চ ২০০৮ তারিখ মৌলভীবাজার জেলার লাউয়াছড়ায় বিভাগের এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ পিকনিকের আয়োজন করা হয়। সেখানে নতুন-পুরাতন মিলিয়ে প্রায় ৬০০ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং লাউয়াছড়ায় বসে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়শন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সে লক্ষ্যে অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালামকে আহবায়ক; জনাব রোবায়েত ফেরদৌস, জনাব কাজী মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব আহমেদ পিপুলকে যুগ্ম আহবায়ক; এবং জনাব আক্তারুজ্জামান, জনাব মো: শামসুল হক, জনাব মফিজুর রহমান, জনাব নুরুল আজম পবন, জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, মিস পারভীন সুলতানা ঝুমা, মিস শারমীন রিনভী, জনাব শাহেদ আলম ও মি.স্বপন কুমার দাস প্রমুখদের নিয়ে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। তাঁদেরকে প্রয়োজনে অপরাপর আগ্রহীদের মধ্য থেকে সদস্য কো-অপ্ট করা এবং আগস্ট মাসে বিভাগ দিবসকে সামনে রেখে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ ব্যাপারে আহবায়ক কমিটি বেশ কয়েকটি সভা করে এবং জনাব শামসুল হককে উপদেষ্টা ও জনাব রোবায়েত ফেরদৌসকে আহবায়ক করে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের জন্য একটি গঠনতন্ত্র (খসড়া) প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। তাঁরা তা' যথা সময়ে প্রণয়ন করেন। বিশিষ্ট আর্টিস্ট মি. সমরজিত রায় চৌধুরীকে দিয়ে অ্যালামনাই 'লোগো' তৈরি করা হয়। এতসব ধারাবাহিকতা, অসংখ্য মানুষের আগ্রহ, উদ্যোগ ও ত্যাগ মিলিয়ে ২০০৮ সালের ৯ আগস্ট টিএসসি-তে আয়োজন করা হয় বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের একটি মিলনমেলা। আর এই আয়োজন থেকে সেখানে অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালামকে সভাপ্রধান এবং জনাব মো: শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হয় ৪২ সদস্য বিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি। শুরু হয় আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আনুষ্ঠানিক যাত্রা-প্রতিষ্ঠিত হয় ডি ইউ এমসিজে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (DUMCJAA)।

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম, সভাপতি এবং মো: শামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক
ডিইউএমসিজে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

Department of Mass Communication and Journalism at a Glance

Prof. Dr. Shaikh Abdus Salam

Established	:	1962
Programmes Offered	:	BSS (Hons); MSS (Regular); Regional Masters (Special 2-yrs. Programme in Collaboration with Nepal, Norway and Pakistan Universities/Institutes); M.Phil and Ph.D
Number of Students at Present	:	About 500
Number of Students Passed	:	About 2000
Faculty Members	:	30
Faculty Staff	:	11 Current
Chairperson	:	Professor Dr. Gitiara Nasreen
Management of the Department	:	The Department is managed and administered by two committees, namely Academic Committee and Coordination and Development (C&D) Committee headed by the Chairman.
Previous Chairmen of the Department	:	Since its inception 15 Chairmen served the Department with great competence and esteem. The list of those are given below.

No.	Name	Tenure	
1.	Atiquzzaman Khan	2-8-1962	31-1-1972
2.	Q A I M Nuruddin	1-2-1972	31-6-1976
3.	Dr. Sakhawat Ali Khan	1-7-1976	1-7-1979
4.	Q A I M Nuruddin	2-7-1979	1-7-1982
5.	Shamsul Majid Haroon	2-7-1982	19-6-1984
6.	Q A I M Nuruddin	1-2-1984	10-8-1987
7.	Md. Tawhidul Anwar	11-8-1987	10-8-1990
8.	Dr. Md. Golam Rahman	11-8-1990	10-8-1993
9.	Dr. A. A. M. S. Arefin Siddique	11-8-1993	10-8-1996
10.	Dr. Sitara Parvin	11-8-1996	10-8-1999
11.	Dr. Ahaduzzaman Mohammad Ali	11-8-1999	10-8-2002
12.	Dr. Sakhawat Ali Khan	11-8-2002	31-8-2004
13.	Dr. Md. Golam Rahman	1-9-2004	4-6-2006
14.	Dr. Shaikh Abdus Salam	5-6-2006	4-6-2009
15.	Dr. Gitiara Nasreen	5-6-2009	

Faculty Members of the Department

Professor

Dr. M Golam Rahman
Dr. Ahaduzzaman M. Ali
Dr. A A M S Arefin Siddique
[Now, Vice-Chancellor, D.U]
Dr. Shaikh Abdus Salam
Shamsul Majid Haroon
Kazi Abdul Mannan
Ms. Akhter Sultana
Dr. Gitiara Nasreen

Associate Professor

Mofizur Rhaman
Robaet Ferdous
Dr. Kaberi Gayen
Dr. Abul Mansur Ahmed
Dr. A J M Shafiul Alam
Dr. Fahmidul Hoque

Assistant Professor

Ms. Samia Rahman
Naadir Junaid
Ms. Sabrina Sultana Chowdhury
S. M. Shameem Reza
A S M Asaduzzaman
Ms. Afroza Bulbul
Ms. Shaonti Haider
Dr. Sudhangshu Shekhar Roy

Lecturer

Ms. Suriya Begum
Shameem Mahmud
Mohammad Khorshed Alam
Ms. Sabnam Azim
Saiful Hoque
Mohammad Saiful Alam Chowdhury
Ms Kajali Sehreen Islam

Professor Supernumerary

Dr. Sakhawat Ali Khan

Besides, there are a number of Adjunct Teachers from profession and academia.

Internship Programme, Placement and Exchange	:	The Department organizes internship programme in cooperation with national/ international/ private organizations for the senior students and arrange their placement at different media/ communication organizations. It also arranges exchange programme for both teachers and students home and abroad.
Seminars and Workshops	:	The Department organizes regular seminars, workshops, research meetings etc.
International/ Regional Programme	:	The Department has been running a 2-years Regional Master Programme in Journalism, Media and Communication in partnership with Oslo University College, Norway; The University of Punjab, Pakistan and College of Journalism and Mass Communication (CJMC), Nepal. Teachers and students from all these partner countries are taking part in teaching and learning to this programme.
Computer Lab, Photo Lab and Media Center Facilities	:	The Department has one computer lab (with 60 computer) and one photo lab. Desktop publishing, photojournalism courses are supported by these two labs. Beside it has a media centre for supporting other technical courses. It has a midern seminar/ library facility. Class rooms are equiped with computer/ internet/ multimedia facilities.
Student Counseling and Guidance	:	The Department has a special seminar library with about 6000 books and journals. There are two teachers engaged in provide counseling and guidance to the students.
Co-curricular and Extra Curricular Activities	:	The Department organizes exhibitions, debate competition, yearly sports and cultural programmes, picnic, study tours etc. The students participate in inter-university sports too. At times they organize programmes in collaboration with Dhaka University Mass Communication and Journalism Alumni Association (DUMCJAA)
Other Logistics and Support Services	:	The office of the Department is very supportive to both teachers and students. The support staffs are extremely caring and cordial to every one under the leadership of Majid Bhai

---

Professor, Dept. of Mass Communication and Journalism and President, DUMCJAA

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

সাইফুল হক

প্রিয় অ্যালামনাই,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন বছর পার করছে। শুরুর পর থেকে নানা ধাপ পেরিয়ে সংগঠন তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যের দিকেও এগিয়ে যাচ্ছে কাঙ্খিত গতিতে। এরই মধ্যে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বিভাগের দুজন সাবেক শিক্ষক জনাব খন্দকার আলী আশরাফ ও জনাব আনিসুর রহমানকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে অ্যাসোসিয়েশন তার দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। এছাড়া বিভাগ দিবস উপলক্ষে বিভাগকে অনুদানও দেয়া হয়েছে।

প্রিয় অ্যালামনাই,
এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে অ্যাসোসিয়েশনের অর্থ ব্যায় হয়েছে যা কমিটির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে এ রিপোর্টের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। একই সাথে আপনাদের আনন্দের সাথে জানাতে চাই দুই বছরে বিভাগের নৌবিহার ও ২০০৯ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার স্মরণিকা বাবদ বিজ্ঞাপন ও অনুদান বাবদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আয় হয়েছে যা অ্যাসোসিয়েশনের তহবিলকে সমৃদ্ধ করেছে।
তবে একটি বিষয়ে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি গত দুই বছরে কেবল ৩৩ জন নতুন সাধারণ সদস্য পদ লাভ করেছে।

প্রিয় অ্যালামনাই,
একটি সংগঠনের মূল বুনিয়াদ তার আর্থিক শক্তি। এ শক্তিকে আমরা যত বেশি জোরদার করতে পারব সংগঠন তত শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এ লক্ষ্যে নতুন সদস্য সংগ্রহের পাশাপাশি তহবিল গঠনের অন্যান্য উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

প্রিয় বন্ধুরা,
অর্থ আয় ও ব্যয় সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা আমাদের প্রত্যেক অ্যালামনাইয়ের থাকা প্রয়োজন। একই সাথে এটা জানা আমাদের প্রত্যেকের অধিকারও বটে। সে লক্ষ্যেই এখানে আয় ব্যায়ের হিসাব উপস্থাপন করা হল। এ বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন বা জ্ঞাতব্য থাকলে তা সরাসরি কিংবা সম্পাদকের মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে।

২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব (১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত)

আয়		
১. বিজ্ঞাপন ও অনুদান	:	৯৩৩৪৭০.৫০
২. ব্যাংক সুদ	:	১৩০৬৪.৯৩
মোট	:	**৯৪৬৫৩৫.৪৩**
(নয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত পয়ত্রিশ টাকা তেতাল্লিশ পয়সা)		
ব্যয়		
১. বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৯ বাবদ	:	৩৩৫০০০.০০
২. স্মরণিকা মুদ্রণ খরচ	:	৩৫০০০.০০
৩. সেমিনার বাবদ	:	৩৫০০০.০০
৪. আপ্যায়ন (কার্যনির্বাহী কমিটির সভা)	:	১৫৪১৪.০০
৫. নৌ বিহার ২০১০ বাবদ	:	৮৫০০০.০০
৬. দুইজন সাবেক শিক্ষককে চিকিৎসা সহায়তা	:	১৮০০০.০০
৭. বিজ্ঞাপন আনায়ন কমিশন	:	৫০০০.০০
৮. নৌ বিহার ২০১১ বাবদ	:	২৫৩২৬০.০০
৯. প্রকাশনা উৎসব	:	১১০০০.০০
১০. ইফতার পার্টি ২০১১ বাবদ	:	১৫০০০.০০
১১. ব্যাংক হিসাব পরিচালনা বাবদ	:	৩২৩৪.৪৯
১২. বিবিধ (স্টেশনারি, ফটোকপি, কম্পোজ, ব্যানার)	:	৮১৮০.০০
মোট	:	**৮১৯০৮৮.৪৯**
(আট লক্ষ উনিশ হাজার আটাশি টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা)		
ব্যাংকে সঞ্চিত মোট অর্থ :		
পূর্বের ব্যাংক উদ্বৃত্ত	:	১৩৩৪৮৭.৩০
চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত (আয়-ব্যয়=৯৪৬৫৩৫.৪৩-৮১৯০৮৮.৪৯)	=	১২৭৪৪৬.৯৪
মোট	:	**২৬০৯৩৪.২৪**
(দুই লক্ষ ষাট হাজার নয়শত চৌত্রিশ টাকা চব্বিশ পয়সা)		
নগদ তহবিল :		
পূর্বের নগদ তহবিল	:	১২২১৭.৪৮
নতুন সদস্য রেজিস্ট্রেশন বাবদ (২০১০-১১)	:	৬০০০.০০
ব্যয় :		
বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৯ এর ডাক বাবদ	:	২৩২০.০০
বিভাগ দিবস ২০১০ বাবদ অনুদান	:	৭০০০.০০
চিকিৎসা অনুদান	:	২০০০.০০
চেক বই উত্তোলন	:	২০০.০০
মোট	:	**১১৫২০**
হাতে নগদ জমা	:	**৬৬৯৭.৪৮**
(ছয় হাজার ছয়শত সাতান্নবই টাকা আট চল্লিশ পয়সা)		

পাখির চোখে দেখা দেশের ছয় দশক

সমাজ, রাজনীতি, সাংবাদিকতা

সাখাওয়াত আলী খান

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, এটি প্রধানত ব্যক্তিগত উপলব্ধিজাত একটি লেখা। জন্মের পর সাত দশকের অধিককাল ধরে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এলাকায় আলো-বাতাসে বসবাস এবং সেই অঞ্চল প্রত্যক্ষ করে, এই এলাকা সম্পর্কে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে শুনে শুনে এবং কিছু লেখাপাড়া ও গবেষণার চেষ্টা করে আমার যে উপলব্ধি হয়েছে, তা-ই সাহস করে বর্ণনা করার এই ঝুঁকি নিয়েছি।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন আইন প্রণয়নের পর থেকে ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসনের ধারণাটি রূপ পেতে শুরু করে। এখানকার রাজনীতিক ও সচেতন নাগরিকেরা এটাতে স্বাধীনতা না হলেও 'স্বরাজ' অর্জনের সম্ভাবনা দেখতে পান। এর কয়েক বছর পরই এক বাঙালি মুসলমান পরিবারে আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের বছরই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বাঙালি মুসলমানদের কাছে সেই সময়ে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ***দৈনিক আজাদ*** পত্রিকা ভারত শাসন আইন প্রণীত হওয়ার অল্পকাল পরই প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন সাংবাদিক ও রাজনীতিক মওলানা আকরম খান। মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে তখন ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। মওলানা আকরম খান তখন মুসলিম লীগেরই বাংলা অংশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। জিন্না সাহেব একসময় ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় থাকলেও পরে তিনি 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' নামক এক রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রবর্তন করে ভারতীয় মুসলমান নেতাদের সেদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য তার আগে কংগ্রেস পার্টিতে থেকেও মুসলিম লীগ করার রেওয়াজ ছিল। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকও একসময় একই সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় পদে আসীন ছিলেন। 'জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব' ধারণা প্রবর্তনের আগে ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থেকেই ভারতীয় মুসলমানদেরও স্বার্থ রক্ষার তৎপরতা চালানোই ছিল মুসলিম লীগ নেতাদের রাজনীতির অংশ। কিন্তু ১৯৪০ সালে যখন মুসলিম লীগের ***লাহোর প্রস্তাব*** গৃহীত হয়, যা পরবর্তীকালে ***পাকিস্তান প্রস্তাব*** নামে অভিহিত হয়েছে, তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এমন সদ্ভাব ছিল না। তবে লক্ষযোগ্য যে, লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটিও ছিল না। এটা ছিল ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব। পরে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ নেতারাই একাধিক রাষ্ট্রের বদলে একটি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। মূল লাহোর প্রস্তাব অক্ষুণ্ন রেখে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে বাংলা মুসলিম লীগের একাংশের নেতারা সোচ্চার হলেও তা কেন্দ্রীয় নেতারা গ্রাহ্য করেন নি। পরে এই এক রাষ্ট্রের নাম রাখার সিদ্ধান্ত হয় 'পাকিস্তান' যা ভারতের কিছু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার নামের ইংরেজি অদ্যাক্ষরগুলোর সমন্বয়ে প্রণীত। সেখানে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের নামের অদ্যাক্ষর থাকলেও বাংলার নাম ছিল না। এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতারা তাঁদের প্রস্তাবিত পাকিস্তানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে সম্ভবত আগ্রহী ছিলেন না।

এই সঙ্গে এ কথাটিও বলে নেওয়া দরকার যে, আসলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিয়েই নেতাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। মুখে পাকিস্তান দাবির পক্ষে খুব সোচ্চার থাকলেও অনেক মুসলিম নেতাই যে ভারতীয় বা বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দাবি আদায়ের ব্যাপারে একদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবেই এটাকে গণ্য করতেন, তা তখনকার অনেক ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্লান্ত, শ্রান্ত, প্রায় বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড তখন আর তার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের ভার বইতে পারছিল না। তখনকার ইতিহাসই তার সাক্ষী। তাই তো ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর পরই ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার অগ্রিম ঘোষণা দিয়েছিল। প্রথম তারা জানাল ১৯৪৬ সালেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে, সেই স্বাধীনতা 'গ্রহণ' করার প্রস্তুতির জন্য তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা, আলোচনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তারিখ পিছিয়ে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের আগস্টে দিলেন সেই 'স্বাধীনতা'। এখানে অবশ্য স্বীকার করা ভালো যে, ব্রিটেনের দেওয়া সেই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য ভারতীয় কংগ্রেস ও বিপ্লবীরা তাঁদের আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই ব্রিটিশ সরকারের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল। এরই মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন তীক্ষ্মধী ও চতুর রাজনীতিক জিন্না তাঁর 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল করার কৌশল গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানি জিন্নার 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' অর্থহীন ও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কী ছিল এই 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব'? জিন্না বলেছিলেন, ভারতীয় মুসলমানরা এক জাতি। তার যুক্তি ছিল যেহেতু তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী কাজেই তারা এক জাতি। আর তার মতে ভারতবর্ষে রয়েছে দু'টি জাতি, হিন্দু ও মুসলমান। কাজেই ভারতীয় মুসলমানদের চাই আলাদা বাসভূমি এবং সেই বাসভূমিই হবে পাকিস্তান। এই ছেঁদো কথার ত্রুটি এবং ভ্রান্তি ধরতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই কথা মেনে নিলে, এক অর্থে সারা পৃথিবীর মুসলমানরাও একটি জাতি হয়ে যায় কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে, ইরানি, ইরাকি, তুর্কি, মিসরীয়, সিরীয় জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে তাদের এক জাতি ঘোষণা করতে হয়।

তা ছাড়া উদাহরণস্বরূপ ইন্দোনেশীয় মুসলমানরা কি রাজি হবে তুর্কি মুসলমানদের সঙ্গে এক জাতিভুক্ত হতে? বাঙালি ও পাঞ্জাবি মুসলমানরা যে এক জাতি নয় তা একাত্তরে পাকিস্তানিদের জঘন্যতম নৃশংসতার মধ্যেই সন্দেহাতীতভাবে প্রামাণিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, জিন্না ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের দুই জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে দুই রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানালেন। সে ক্ষেত্রে এই দুই ধর্মের অনুসারী নয় এমন ভারতীয়দেরও কি অধিকার থাকে না আলাদা রাষ্ট্র দাবি করার? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে, জিন্না মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে তার অযৌক্তিক পাকিস্তান দাবি করলেন, কিন্তু উভয় রাষ্ট্রে থেকে যাওয়া বিপুলসংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এই প্রস্তাব মেনে নেবে কেন? জিন্না বোধকরি লোক বিনিময়ের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন। কিন্তু এত লোক বিনিময় কি সম্ভব ও বাস্তব ছিল? তা ছাড়া জিন্না যেকোনো ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের বাস্তুহারা করার অধিকার কোথায় পেলেন? ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তার জোরে গোঁজামিল দিয়ে তড়িঘড়ি একটা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে তিনি এক বছরের মধ্যেই লোকান্তরিত হলেন। পেছনে রেখে গেলেন পর্বত সমান সমস্যাবলি। ফলে পরিণতি কী হয়েছে সাম্প্রদায়িক ইতিহাসই তার উৎকৃষ্ট সাক্ষী।

পাকিস্তান হওয়ার ঠিক আগের ইতিহাস তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোতে বিধৃত হয়ে আছে। তার মধ্যে জিন্নার পাকিস্তানের সমর্থক পত্রিকাগুলোতে বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দের তৎপরতা ও মনোভাব এবং পাকিস্তান সম্পর্কে সার্বিকভাবে বাঙালি মুসলমানের ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়ে আছে। মোটামুটিভাবে তৎকালীন পূর্ব বাংলা নিয়েই পাকিস্তানের পূর্বাংশ গঠিত হয়েছিল। গণভোটের ভিত্তিতে অবশ্য সিলেটকেও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বলাই বাহুল্য, পূর্ব বাংলায় মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাই পূর্বাপর চিন্তা না করে তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও রাজনীতিকেরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রধানত কৃষিনির্ভর অনুন্নত পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ হিসেবে গড়ে তোলার মতো কোনো অবকাঠামোরই অস্তিত্ব ছিল না।

এই অবস্থা যে হতে পারে, সে সম্পর্কে চিন্তা করেই সে সময় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের চিন্তাশীল বেশ কিছু নেতা কলকাতাসহ বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমন চিন্তা যেসব মুসলিম লীগ নেতা করেছিলেন, তাদের সে চিন্তার বা চেষ্টার ফলাফল কী হয়েছিল, তা সেই সময়কার পাকিস্তানপন্থী পত্রিকাগুলোতেই ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তখন এসব পত্রিকার মধ্যে প্রধানতম ছিল দৈনিক আজাদ, বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক ও প্রশ্নাতীত। এটির মালিক ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগ প্রধান আকরম খান এবং সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এরা পাকিস্তানোত্তর কালেও নানা কারণে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছেন। এ ছাড়া পাকিস্তান হওয়ার প্রাক্কালে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক ইত্তেহাদ। এর সম্পাদক ছিলেন খ্যাতিমান সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ। কলকাতা থেকে পাকিস্তান দাবির সমর্থক তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে ছিল ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'মর্নিং নিউজ' ও 'স্টার অব ইন্ডিয়া'। এ ছাড়া ছিল তদানীন্তন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিমের পত্রিকা মিল্লাত।

খুব সংক্ষেপে এই পত্রিকাগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় যে, মুসলিম লীগের ভেতরে বিভিন্ন উপদলের সমর্থক ছিল পত্রিকাগুলো। আকরম খানের আজাদ মূলত তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নার রাজনীতির প্রতিই সমর্থন জোগাত। ইত্তেহাদ ছিল তুলনামূলকভাবে ক্ষণজীবী এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল বাংলার মুসলিম লীগ দলীয় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতির সমর্থক। মিল্লাত স্বাভাবিক কারণেই সমর্থক ছিল আবুল হাশেমের রাজনীতির। দুটি ইংরেজি পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও এরা প্রধানত বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অবাঙালি কোষাধ্যক্ষ হাসান ইস্পাহানির ও মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উর্দুভাষী খাজা নাজিমউদ্দিনের রাজনীতির সমর্থক ছিল।

একই দল মুসলিম লীগের ভেতরে সৃষ্ট উপদলগুলোর নেতৃত্ব দিতেন উপরিউক্ত নেতৃবৃন্দ। এই সময়ে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কৃত থাকায় লীগ রাজনীতিতে তার সমর্থক কোনো পত্রিকা ছিল না। পরে অবশ্য পাকিস্তান সৃষ্টির কিছু আগে ফজলুল হক মুসলিম লীগে পুনরায় যোগদান করলে আজাদ পত্রিকা তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। উল্লেখ্য, যখন ফজলুল হক মুসলিম লীগে ছিলেন না তখন আজাদ পত্রিকা নির্বিচারে তার রাজনীতির কঠোর সমালোচনা করত। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর আজাদ ও মর্নিং নিউজ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ইত্তেহাদ অনেক চেষ্টা করেও খাজা নাজিমউদ্দিন সরকারের বিরোধিতার কারণে কলকাতা থেকে ঢাকায় আসতে পারে নি।

আজকের বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও রাজনীতির সঙ্গে উপরের আলোচ্য বিষয়গুলোর গভীর যোগসূত্র থাকায় সেই প্রাসঙ্গিক সময়ের সংক্ষিপ্ত অলোচনা করার চেষ্টা করেছি। ভারত বিভক্তির আগে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সকল প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারই কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা। মওলানা ভাসানী তখন অবশ্য ছিলেন আসাম মুসলিম লীগের নেতা। ফলে তিনি আসামেই অবস্থান করতেন। কিন্তু আসাম ও বাংলার মুসলিম লীগ সমর্থক প্রধান পত্রিকাগুলো কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। সেইসঙ্গে এটাও লক্ষযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী দশকে অবিভক্ত বাংলার সব ক'জন প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন মুসলমান। তারা সংখ্যায় ছিলেন তিনজন। তাদের মধ্যে খাঁটি বাঙালি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, বাকি দুজনও বাঙালিই ছিলেন, কিন্তু ঠিক বাংলাভাষী ছিলেন না। তবে তারা পরিপূর্ণভাবে বাংলারই অধিবাসী ছিলেন। সেই অর্থে তাদেরও অবশ্যই বাঙালি বলতে হবে। বরিশালের শেরে বাংলার জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালিপ্রীতি সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মেদিনীপুরের কলকাতাবাসী সোহরাওয়ার্দী ভালো বাংলা বলতে না পারলেও রাজনীতিতে আজীবন বাংলার স্বার্থ দেখার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে ঢাকা নবাব পরিবারের খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলার অধিবাসী হয়েও অবাঙালি স্বার্থের পক্ষেই কাজ করেছেন। তবে এটা ঠিক যে, ঢাকার নবাব পরিবার বাংলাদেশে স্থায়ী হলেও তারা কাশ্মীর থেকে এসেছেন বলে দাবি করতেন। এদের তিনজনেরই রাজনীতিতে ওয়েস্টমিনিস্টার স্টাইল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ ছিল। সামরিক স্বৈরাচারের সঙ্গে এরা কখনোই আপস করেন নি।

এখন আমরা যে ভূখণ্ডে বসবাস করি। নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বাঙালির এক মহান মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতিতে তার নাম হয়েছে বাংলাদেশ। তবু আমরা জানি, এটাই একসময় ছিল পাকিস্তানের পূর্বাংশের একটি প্রদেশ, প্রথমে নাম ছিল পূর্ববঙ্গ, পরে নামকরণ হয় পুর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে লাখ দেড়েক লোকের বাসস্থান অতি অনুন্নত একটি ধূলি-ধূসরিত মফস্বল শহর ঢাকাকে করা হয় প্রদেশের রাজধানী। ঢাকায় একমাত্র সুদৃশ্য এলাকা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, যা তখন সম্পূর্ণ রমনা এলাকায় বিস্তৃত ছিল। এই শহরে স্যানিটারি শৌচাগারও ছিল বিরল, অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না, শহরে মোটরগাড়ির সংখ্যা ছিল হাতেগোনা, ছিল বেশ কিছু ঘোড়ার গাড়ি এবং অল্পসংখ্যক রিকশা। এক কথায় নাগরিক সুবিধার অধিকাংশই ছিল অনুপস্থিত এবং সর্বোপরি আমাদের আলোচনার জন্য একান্ত প্রাসঙ্গিক এই শহরে কোনো দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না।

এই উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দী থেকে এই অঞ্চলের পত্র-পত্রিকাগুলোতে রাজনীতিই সাংবাদিকতার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। সেই ঐতিহ্য এখনো শেষ হয় নি। এখনো প্রধানত রাজনীতিমনস্করাই বা রাজনীতি করতে আগ্রহী ব্যক্তিরাই সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকেন। এখন যখন কর্পোরেট সাংবাদিকতার লক্ষণ বাংলাদেশেও দেখা দিচ্ছে বলে আলোচনা চলছে, তখন মালিকানার ধরনে কিছুটা পবিবর্তন আসলেও রাজনীতিই এ দেশের সাংবাদিকতার প্রধান উপজীব্য বিষয় হিসেবে থেকে যাচ্ছে। চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলো প্রাসঙ্গিকতার কারণে আমাদের আলোচনায় এসেছে সেগুলোরও চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। এ ছাড়া আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তারা লিপ্ত ছিল রাজনীতির উপদলীয় কোন্দলে। উপদলের সিদ্ধান্ত পবির্তিত হলে তাদের ভূমিকাও পাল্টে যেত। সেই সময়ের মুসলিম লীগের এই উপদলগুলোকে অন্তত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। একটি গ্রুপকে বলা যায় আকরম খান-নাজিমউদ্দিন-ইস্পাহানী উপদল, অপর একটি গ্রুপ সমর্থক ছিল সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের। সোহরাওয়ার্দী বরাবরই পাশ্চাত্য ঘেঁসা, ইংল্যান্ড থেকে আইনের বড় ডিগ্রিপ্রাপ্ত, কিন্তু গভীরভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিমের মানসিক গঠন ছিল একটি ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি পাকিস্তান দাবিকে ভিন্ন একটি আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তার পত্রিকা মিল্লাতে প্রকাশিত বক্তব্যে দেখা যায় যে, আবুল হাশিম পাকিস্তান দাবিকে সাম্প্রদায়িক না বলে শ্রেণী-সংগ্রামের আলোকে দেখাতে চেয়েছেন। তার কথায় মর্মার্থ সম্ভবত ছিল এই যে, ভারতবর্ষে মুসলমানরা নির্যাতিত, বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণী বলেই তারা ছিল প্রোলেতারিয়েত বা সর্বহারা। কাজেই পাকিস্তান সংগ্রাম বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারারই সংগ্রাম, ইত্যাদি। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির সমর্থনকারী সেই সময়ের উপরিউক্ত পাঁচটি পত্রিকার মধ্যে আবুল হাশিম পরিচালিত মিল্লাত সে কারণেই স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার হতে পারে।

ভারত বিভক্তির ঠিক অগে ঘটে যাওয়া আরও একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা এখানে অত্যন্ত প্রয়োজন। সে হলো সেই সময়ের উত্থাপিত স্বাধীন বাংলার দাবি। সেই দাবিটি মোটামুটি এই ছিল যে, এই অঞ্চল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বরং তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা ও আসাম প্রদেশকে নিয়ে একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা হোক। উল্লেখ্য যে, তখনকার আসাম ছিল বর্তমানে ভারতের সেভেন সিস্টারস নামে অভিহিত সাতটি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি বড় প্রদেশ। যুক্তি ছিল এই যে, প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে তৎকালীন জনসংখ্যার হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানরা হবে প্রায় সমসংখ্যক, ফলে কোনো সম্প্রদায়েরই একক একাধিপত্য থাকা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া এই রাষ্ট্র যেমন খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে হবে ঐশ্বর্যশালী, তেমনি এই রাষ্ট্রে থাকবে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি শহর কলকাতা। এ ছাড়া এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে আরও অনেক যুক্তি দিয়েছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তাবৃন্দ যাদের মধ্যে ছিলেন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রথম কাতারের বাঙালি নেতৃবৃন্দ। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ দলীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম, কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা শরৎচন্দ্র বসু (নেতাজী সুভাষ বসুর অগ্রজ), তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের কংগ্রেস দলীয় পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা কিরণশঙ্কর রায়। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খানেরও এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন ছিল। এ ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ দুই নেতা গান্ধী ও জিন্নারও এই প্রস্তাবের প্রতি সায় ছিল। মওলানা আকরম খানের পত্রিকা আজাদে তখন মওলানা নিজেই প্রস্তাবিত এই রাষ্ট্রের নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গাসাম' রাষ্ট্র। কিন্তু বঙ্গাসাম রাষ্ট্র বাস্তবায়িত না হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে অন্তত দুটি কারণের একটি ছিল ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা, নোয়াখালী ও বিহারে সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, যাতে দুই পক্ষের মধ্যে এই প্রস্তাবের প্রতিকূল গুরুতর অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয় কারণটি ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভেতরে এই প্রস্তাবকে ঘিরে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উপদলীয় তৎপরতা, যা পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলেছিল। অনেক নেতাই মুখে এক অন্তরে আরেক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা খাজা নাজিমউদ্দিন বিবৃতি দিয়ে স্বাধীন বাংলার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েও শেষ পর্যন্ত বাংলা বিভক্তির পক্ষেই তৎপরতা চালিয়েছেন। আকরম খানের বক্তব্যও এই প্রশ্নে ছিল বিভ্রান্তিকর। সবশেষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অনেক গুরুতর প্রশ্নই চাপা পড়ে গিয়েছিল। তবে অনেক ইতিহাসবিদই মনে করেন যে, কংগ্রেসের দুই বড় নেতা নেহেরু ও প্যাটেলের স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের বিরোধিতা করাই ছিল এটি বাস্তবায়িত হতে না পারার অন্যতম বড় কারণ।

যাই হোক, পাকিস্তান সৃষ্টি হলো। কিন্তু যেভাবে হলো তাতে অনেক নেতাই খুশি হতে পারেন নি। সবচেয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন পাকিস্তানের জনক জিন্না। তিনি আফসোস করে বলেছিলেন, তিনি যে পাকিস্তান আশা করেছিলেন সে পাকিস্তান তিনি পান নি। তার নিজের ভাষায় তিনি পেয়েছিলেন 'পোকায় খাওয়া খণ্ডিত পাকিস্তান'। এই 'পোকায় খাওয়া খণ্ডিত পাকিস্তান' পেয়ে বাঙালি মুসলমানেরা কতখানি সন্তুষ্ট হয়েছিল, তা পরবর্তী ইতিহাসেই বিধৃত হয়ে আছে। বাংলা ভাগ করার সময় তাড়াহুড়ার ভাবটা এতটাই ছিল যে, দুদেশের মধ্যে প্রায় পৌনে দু'শ ছিটমহল রেখেই ভাগ সম্পন্ন হলো। এক রাষ্ট্রের ভেতর অন্য রাষ্ট্রের এমন ছোট ছোট ভূখণ্ড রেখে দেওয়ার মতো অবাস্তব সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এখনো ছিটমহল সমস্যা দুদেশের মধ্যে প্রকটভাবে বিরাজ করছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের ভেতর ভারতীয় ছিটমহলের সংখ্যাই বেশি।

একথা ঠিক যে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বাঙালি মুসলমানরাই পাকিস্তান দাবির প্রতি সবয়েচেয়ে বেশি সমর্থন দিয়েছিল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা কেন এই সমর্থন দিয়েছিলেন? তারা হয়তো ভেবেছিলেন, তখন সমাজে নেতৃত্বদানকারী বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য মুক্ত হয়ে তারা তাদের পাকিস্তানে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের সেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যে পুরোপুরি সঠিক বলে তাদের নিজেদের কাছেই মনে হয় নি, তা তারা কয়েক বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৫৪ সালেই নির্বাচনে পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগ দলকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে অনেকটাই দৃশ্যমান করে দিলেন। বাঙালি মুসলমানদের চেয়েও পাকিস্তান সৃষ্টিতে বেশি লাভবান হয়েছিলেন বাঙালি সেজে কলকাতায় বসবাসকারী অবাঙালি ব্যবসায়ী যথা, আদমজী, ইস্পাহানীরা। হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগের ফলে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকেই চাকরি পেয়েছিলেন, চাকরিতে উন্নতিও দ্রুততর হয়েছিল। স্কুল-কলেজে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছিল। মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে একটি দেশপ্রেমিক চিন্তাশীল শ্রেণী গড়ে ওঠার সুযোগ হয়েছিল।

তবে দরিদ্র মুসলমানরা কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টিতে তেমন কোনো লাভবান হয় নি, অনেকের বিশ্লেষণে বরং দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। একইসঙ্গে পাকিস্তানের তথাকথিত চেতনার নামে রাষ্ট্রের অত্যধিক সাম্প্রদায়িক আচরণে বিবেকবান মানুষেরাও প্রথম থেকেই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। এ ছাড়া অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পাকিস্তান সৃষ্টিতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল হিন্দুদের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখলকারী দুর্বৃত্তরা।

এটা ঠিক যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রকে তখন একটা অনিবার্য বাস্তবতা বলেই বাংলার মানুষ মেনে নিয়েছিল। দল-মত নির্বিশেষে তৎকালীন সব সরকারই চেষ্টা করেছে পাকিস্তানকে একটি সচল নতুন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে। কিন্তু এ পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। একমাত্র ক্ষণস্থায়ী যুক্তফ্রন্ট গঠন করা ছাড়া পূর্ব বাংলার মানুষেরা সে সময় ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে নি। সেই সুযোগ খুব ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিল বাংলার স্বার্থবিরোধীরা। এ ছাড়া ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিপাকে ফেলতে করাচির অবাঙালি শাসকেরা কৌশলে আদমজী মিলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিল। সত্যি বলতে কী, এই তথাকথিত দাঙ্গা বাধিয়ে নিজ রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের কৌশল এই অঞ্চলে চল্লিশ, পঞ্চাশ এমনকি ষাটের দশকেও অব্যাহত ছিল। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান বেশ বড় আকারের দাঙ্গা সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন যে, কলকাতা দাঙ্গা না হলে পাকিস্তানই হতো না। কলকাতার পর নোয়াখালী ও বিহারেও এরূপ দাঙ্গায় বিপুলসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান প্রাণ হারিয়েছিল। এগুলোকে মুসলিম লীগ দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজে লাগিয়ে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, হিন্দু-মুসলমানের একসঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু হাজার বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান যে এই উপমহাদেশে কার্যকরভাবে একইসঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করে আসছিল সেই সত্যটি তখন খুব একটা উচ্চারিত হয় নি।

পাকিস্তান হওয়ার পর সেটি মাত্র তেইশ বছর টিকেছিল। এর মধ্যেই এই নতুন রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি পশ্চিমা শাসকদের আধিপত্য, শোষণ এবং বর্বর নির্যাতন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাষ্ট্র তৈরি করে নামকরণ করল বাংলাদেশ। কাজেই এই বাংলাদেশের ইতিহাস পাকিস্তান আমলের পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব নয়। নাম পূর্ব পাকিস্তান হলেও সেই প্রদেশের বাঙালিরা যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল তা বোঝার জন্যও সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলোই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল। সেই সময়ের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ঘটনাবলি যথা, পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন, এই প্রদেশে সংঘটিত ভোট বিপ্লব (১৯৫৪), পঞ্চাশ দশকে বাঙালিদের সার্বিক রাজনৈতিক অনৈক্য, দৃষ্টিকটু রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পরিণামে প্রদেশে এবং কেন্দ্রে ঘনঘন সরকার পরিবর্তন এবং সবশেষে পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল ইত্যাদি বিষয় জানতে-বুঝতে চাইলে আমাদের সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার দ্বারস্থ হতেই হবে। কারণ শুধু রাজনীতকিদের কর্মকাণ্ড রিপোর্ট করাই নয়, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং বাঙালিদের স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করাই ছিল সে সময়ের সাংবাদিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এ ক্ষেত্রে রাজধানী ঢাকা থেকে ইংরেজি পত্রিকা পাকিস্তান অবজারভার, কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসা দৈনিক আজাদ ও ইংরেজি পত্রিকা মর্নিং নিউজ, সাপ্তাহিক ও দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেহাদ (কলকাতার ইত্তেহাদ নয়) ও দৈনিক মিল্লাত পত্রিকাগুলো পঞ্চাশের দশকেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা মাত্রার ভুমিকা ছিল। বিভাগ-পূর্বকালের কলকাতায় মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলোর মধ্যে আজাদ এবং মর্নিং নিউজকে ঢাকায় আনার ব্যাপারে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার ব্যাপকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু ইত্তেহাদ পত্রিকাটি অনেক চেষ্টা করেও ঢাকায় স্থানান্তরিত হতে পারে নি, যদিও তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইত্তেহাদের পূর্ব বাংলায় উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা ছিল। এই আসতে পারা না পারার পেছনে ছিল মুসলিম লীগের উপদলীয় কোন্দল।

ইত্তেহাদ পত্রিকার মালিক অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রধানকে মুখ্যমন্ত্রী না বলে প্রধানমন্ত্রীই বলা হতো) হোসেন সোহরাওয়ার্দীকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেই আসতে দেওয়া হয় নি। নিরুপায় সোহরাওয়ার্দী করাচিতে চলে গিয়েছিলেন। এইব ঘটনার মূলেও ছিল মুসলিম লীগের উপদলীয় কোন্দল। জিন্নার আশীর্বাদপুষ্ট পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন ছিলেন লীগ রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর ঘোর বিরোধী।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির (১৯৫৮) পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান তথা গোটা পাকিস্তানের রাজনীতিই ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। সামরিক আইন জারির আগেই উল্লিখিত পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। খুব সংক্ষেপে বলতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত আজাদ, সংবাদ, মর্নিং নিউজ ছিল সরকার সমর্থক (যদিও আজাদ পত্রিকা বায়ান্নর ২১ ফ্রেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের সময় দিন সাতেক আন্দোলনের পক্ষে জন-জোয়ারের কারণে আন্দোলনের সমর্থনে লেখালেখি করেছিল), মর্নিং নিউজ বরাবরই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি স্বার্থের ধারক, পাকিস্তান অবজারভার ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সংবাদ

প্রথমে ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক, পরে ১৯৫৪ সালে এর মালিকানা পরিবর্তনের পর এটি প্রগতিশীল ধারার রাজনীতির সমর্থক হয়ে যায়, সাপ্তাহিক ও দৈনিক ইত্তেফাক মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সমর্থক হিসেবে (তখন পত্রিকাটির নামফলকের ওপর লেখা থাকত 'প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবুল হামিদ খান ভাসানী') আবির্ভূত হলেও ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী বিরোধের পর থেকে এটি সম্পূর্ণ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, পঞ্চাশের দশকেই তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর পাশ্চাত্য-ঘেঁসা নীতির প্রতিবাদের মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা 'ন্যাপ' গঠন করেন। দৈনিক ইত্তেফাকের মালিক-সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মোসাফির ছদ্মনামে লিখিত 'রাজনৈতিক মঞ্চ' নামক কলাম তখনকার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মানিক মিয়া সরাসরি রাজনীতি না করলেও সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতিকদের ওপর তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। বাঙালির স্বার্থের বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন ও ষাটের দশকে ছয় দফার সমর্থনে মানিক মিয়া তথা ইত্তেফাকের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাঙালির স্বার্থের পক্ষে লেখালেখির কারণে মানিক মিয়া সামরিক শাসকদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁর পত্রিকা ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করা হয়েছে, তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে। পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালামও ভাষা আন্দোলনে তাঁর পত্রিকার ভূমিকার কারণে জেল খেটেছেন। একাত্তর সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর কামান দেগে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ অফিস ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারা অপর একটি ইংরেজি পত্রিকা 'দ্য পিপল'ও ধ্বংস করে দেয়। পত্রিকাগুলোর ওপর বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর হামলাই তাদের দেশপ্রেমিক ভূমিকার বড় প্রমাণ। উল্লেখ্য যে, একাত্তরের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কামান দেগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারও ধ্বংস করে দিয়েছিল।

আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের আমলে একাধিকবার ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থক ইত্তেফাক ষাটের দশকে মানিক মিয়ার মৃত্যুর পরও এই ভূমিকা অব্যাহত রেখেছিল। সংবাদ প্রত্রিকাটি একদিকে যেমন প্রগতিশীল রাজনীতির মুখপত্র হয়ে ওঠে তেমনি নতুন সাংবাদিকদের ট্রেনিং প্রদানেরও একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। পাকিস্তান অবজারভার বাংলাদেশের ইংরেজি সাংবাদিকতার সফল পথিকৃৎ। আজাদ পত্রিকা মুসলিম লীগের রাজনৈতিক পতন ও আকরম খানের মৃত্যুর পর ক্রমশ দুর্বল হতে হতে বিলীন হয়ে যায়। কিছুটা সম্ভাবনা নিয়ে জন্মালেও ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদ (কলকাতা 'ইত্তেহাদ' নয়) ও দৈনিক মিল্লাত অপক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় সাংবাদিকতায় তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি।

এ দেশে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আটচল্লিশ ও বায়ান্নতে দু'দফায় ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ হিসেবে ও পরে নাম বদলে আওয়ামী লীগের আত্মপ্রকাশ, সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়ে ভাষা আন্দোলন ক্রমে জোরদার রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ, বাঙালি মুসলমান সমাজে একটি সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবিকাশ ইত্যাদি। চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নামে বিজয়ী হয়েও এ দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এই ঐক্য ধরে রাখতে না পারার ব্যর্থতাও একটা বড় ঘটনা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

আটান্ন সালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে সামরিক স্বৈরশাসন শুরু হওয়া একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও প্রচণ্ড ক্ষতিকর ঘটনা। সামরিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এ দেশের সাংবাদিকতায়ও একটা সুষ্ঠু ধারার বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল। সামরিক শাসন সে সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। সামরিক স্বৈরাচারের সময় অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই সাবধানি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। ফলে ষাটের দশকে এ দেশের সাংবাদিকতা তেমনভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে নি। এ সময়ে রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য দু'টি পত্রিকা হচ্ছে, দৈনিক পূর্বদেশ ও দৈনিক পাকিস্তান। পূর্বদেশ ছিল অবজারভার গ্রুপের পত্রিকা এবং দৈনিক পাকিস্তান-এর মালিকানা ছিল পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্ট-এর। ইত্তেফাক-এর প্রকাশনা দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখা হয়। এ দশকে মানিক মিয়ার মৃত্যু সাংবাদিকতাকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বেশ কিছু দক্ষ সাংবাদিক পেশা ছেড়ে দেন। তবে রাজনীতির বাইরে সামাজিক বিষয়াদি বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে রিপোর্ট করে দৈনিক পাকিস্তান উল্লেখযোগ্য পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিছু কিছু কলাম প্রকাশ করে পূর্বদেশও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকায় বিভিন্ন পত্রিকার দক্ষ সাংবাদিকেরা রাজনীতির বাইরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে লেখালেখি করতে বাধ্য হন। কিন্তু নানা লেখায় বাঙালির অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিষয়টি পরোক্ষভাবে হলেও প্রকাশ পেতে থাকে। রাজনীতি সচেতন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তৎপরতায় সে সময় জাতি হিসেবে বাঙালির করণীয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষও চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে।

এই পরিবেশেই আসে ছ'দফা দাবি। প্রথমে ছ'দফা সম্পর্কে কোনো কোনো মহলের রাজনীতিকরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল ছ'দফা বাঙালির জাতীয় দাবিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। তৎকালীন পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকমহলও তা টের পেলেন এবং তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করলেন ছ'ফা দাবি সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে এবং ছ'দফার নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর দমন পীড়ন চালিয়ে ছ'দফা দাবিকে স্তব্ধ করতে। ফল উল্টো হলো এবং ছ'দফা যেমন বাঙালির জাতীয় দাবিতে পরিণত হলো তেমনি বঙ্গবন্ধু বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হলেন। কারাবন্দি মুজিবকে ছাড়িয়ে আনতে আরেক বয়োবৃদ্ধ জাতীয় নেতা মওলানা ভাসানীও জাতিকে নেতৃত্ব দিলেন। মুজিবসহ আরও কিছু বাঙালির বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' করে মুজিবের বিরুদ্ধে বাঙালিকে ক্ষেপিয়ে তোলার সরকারি চেষ্টা বুমেরাং হলো। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা আরও বাড়ল, তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করল। আইয়ুব খান সাহেব ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিজে বাঁচলেন বটে, কিন্তু বাঙালির ওপর পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম নৃশংস হত্যা-নির্যাতন চালিয়েও ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারলেন না।

এইসব ঘটনা ইতহাসে বিবৃত হয়ে আছে। কিন্তু এই ঘটনাবলির চমৎকার চলমান ইতহাস ছিল এ দেশের সংবাদপত্রগুলো। রেডিও-টিভি তখনো ছিল সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন, কিন্তু সরকারি অর্থে পরিচালিত সংবাদপত্রও কিন্তু তখন বাঙালির স্বাধিকার

আন্দোলনের পক্ষেই কাজ করেছে। এমনকি বেতারের কর্মীরাও সরকারি নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে মুজিবের রেকর্ড করা ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সম্প্রচার করে দিয়েছেন। সে সময়ের ঘটনাবলি যারা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের কাছে সম্ভবত ঘটনার পরবর্তী ইতহাস বইগুলোর বর্ণনাও অপ্রতুল মনে হতে পারে। মুক্তি সংগ্রাম যারা দেখেন নি তারা বরং যদি সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলো যোগাড় করে পড়তে পারেন তবেই সম্ভবত সেই সময়ের প্রকৃত চিত্র এবং জনজোয়ারের মাত্রা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। যাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ভবিষ্যতের আরও সফল ও শক্তিশালী ইতিহাস লেখকের মূল উপাদানের উৎস হয়তো তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোই হবে।

আমি প্রথমেই বলেছি, এই লেখা কোনো ইতিহাস নয়, এটি যেন পাখির চোখে দেখা কেবলই উপলব্ধিজাত বর্ণনা। সেই সময়ের দেশের আরও সমৃদ্ধ ও সঠিক ইতহাস এবং বিশেষ করে সাংবাদিকতার ইতিহাস লেখকের পদধ্বনি শোনার আশায় এই সত্তরোর্ধ্ব বয়সে এসেও কান পেতে আছি। মুক্তিযুদ্ধটার প্রকৃত রূপ এবং তার ভেতরের হাসি-কান্না-বেদনা-গৌরবের পরিচয়ইতো আমাদের প্রজন্ম পারে নি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে। সেই অপরাধে অপরাধী হয়ে আমি নিজেও নিজের কাছে বড় ছোট হয়ে আছি। অনুরুদ্ধ হয়ে কিছু লিখেতে গিয়ে এই ক্ষুদ্র রচনার পেছনে কে জানে হয়তো সেই অপরাধবোধই কাজ করেছে। তাই সেই অপরাধবোধ থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়ার আশায় লিখিত এই বিবরণকে ইংরেজিতে যাকে বলে 'বার্ডস আইজ ভিউ' অর্থাৎ যেন উপর থেকে পাখির চোখে দেখা সংক্ষিপ্ত ও অসমাপ্ত বিবরণ বলেই গণ্য করতে হবে।

একাত্তরের সংগ্রাম পেরিয়ে যখন এই স্বাধীন সার্বভৌম দেশটির জন্ম হলো, তখন সেই দেশেও প্রায় নতুন করেই সাংবাদিকতার যাত্রা আবার শুরু করতে হয়েছে। পাকিস্তানিদের বা তাদের বাঙালি দোসরদের মালিকানায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোকে পরিচালনার ভার স্বাভাবিকভাবে সরকারকেই হাতে নিতে হয়েছিল। দেশের প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি এবং প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর কারণে শক্তিশালী গণমাধ্যম গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। যে সংবাদপত্রগুলো পরিচালিত হলো তার প্রধান উপজীব্য বিষয়ও রয়ে গেল রাজনীতি। রেডিও-টিভি যথারীতি রয়ে গেল সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য সমৃদ্ধ সংবাদপত্র গড়ে তোলার মতো পুঁজির বিকাশও তখন হয় নি। এরই মধ্যে গণতন্ত্র ব্যাহত হলো নানা কারণে। ওয়েস্টমিনিস্টার স্টাইল পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, রাষ্ট্রপতি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন, পর পর দু'বার সেনাপতিদের বেআইনি ও জবরদস্তি ক্ষমতা দখল, শাসনতন্ত্রের বেআইনি পরিবর্তন, মহান মুক্তিযুদ্ধের অবমূল্যায়ন, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং তরুণ প্রজন্মের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব ইত্যাদি কারণে এ দেশে গণতন্ত্র চর্চা এক প্রকার স্তব্ধই হয়ে গিয়েছিল। সমাজ ও রাজনীতিতে আদর্শবাদ বিসর্জিত হয়ে তা ভোগবাদী নীতিহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় সুষ্ঠু সাংবাদিকতা বা সংবাদ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠাও ছিল কঠিন।

তবে এই সময়ের আলোচনার আগে টগবগে আদর্শবাদ ও ত্যাগী মানসিকতায় পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশেষ ধরনের সাংবাদিকতার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো দরকার। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এই জাতি যেমন দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে, তেমনি এক মহান মানসিকতায় উজ্জীবিত হয়েছিল। এই ন'মাসে এ দেশে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে যেগুলো কেবল মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করার প্রয়োজনেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া পাকিস্তান আমলে রাজধানী ঢাকায় যেসব সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো তার মধ্যে কয়েকটি প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ একরকম বাধ্য হয়েছিল। সেগুলোকে অনেকেই 'অবরুদ্ধ' সংবাদপত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। এগুলোর ছিল হাত-পা বাঁধা, তারা ছিল জীবন্মৃত। তবে এসব সংবাদপত্রে সেই সময়ে বাঙালিদের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানিদের পক্ষাবলম্বন করেছিল, তাদের কর্মকাণ্ডের মোটামুটি সঠিক বিবরণই প্রকাশ পেয়েছিল।

এ ছাড়া ছিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র। এগুলো মুক্তিযোদ্ধারাই প্রকাশ করেছেন। বলা যায় যে, এগুলোর পরিচালকদের এক হাতে ছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অস্ত্র, অন্য হাতে ছিল লেখার কলম। এগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সংবাদ প্রকাশ ও লেখালেখি করা। এগুলো কোনোটি মুদ্রণ যন্ত্রে ছাপা হয়েছিল, কোনোটি ছাপা হয়েছিল সাইক্লোস্টাইল মেশিনে। কোনোটির আকার একটু বড়, কেনোটি ছিল আকারে বুলেটিনের মতো। এর মধ্যে অল্পসংখ্যক ছাড়া অধিকাংশই ছিল অনিয়মিত। এগুলো দেশের ভেতরের মুক্তাঞ্চলগুলো থেকে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি সীমান্তের বাইরে থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর এবং মুক্তিযোদ্ধা তথা সব দেশপ্রেমিক মানুষের অনুপ্রেরণাদায়ক বিষয়াদি ছাপা হয়েছে। এ রকম বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা এখনো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ নানা মানুষের কাছে নিদর্শনস্বরূপ রয়ে গেছে। এই পত্রিকা প্রকাশে প্রধানত তরুণেরা বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করলেও নানাবয়সী মানুষের সম্পৃক্ততাও কম ছিল না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছোট ছোট সংগঠিত গ্রুপ এবং কখনো কখনো কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সদস্যরা মিলে এই পত্রিকা বের করেছে। বড় দল আওয়ামী লীগের নিয়মিত মুখপত্র ছিল 'জয়বাংলা'। আবার জয়বাংলা নামে একাধিক পত্রিকারও সন্ধান পাওয়া গেছে। ঢাকার কয়েকজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র নটরডেম কলেজের সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি উঠিয়ে এনে ঢাকারই কোনো বাড়ি থেকে পত্রিকা বের করেছে। এমন ঘটনা অন্যান্য অঞ্চলেও ঘটেছে। এইসব পত্র-পত্রিকা বের করতে কারও কোনো অনুমতি নেওয়ার যেমন কোনো প্রশ্ন ছিল না, তেমনি এটি বিলি করার ক্ষেত্রেও ছিল মারাত্মক ঝুঁকি। মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক পরিবেশ না বুঝলে এই ঝুঁকির মাত্রা বোঝা কঠিন। কিন্তু তখন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সর্বত্র এইসব পত্রিকার কপি দেখা গেছে। গোপনে বিলি হওয়া এসব পত্রিকা সারা জাতিকে যে প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছিল, তাতে এটিকে মুক্তিযুদ্ধের একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়।

এই পত্রিকাগুলো ছাড়াও সারা জাতিকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার'। এই বেতার বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধকালীন লুকিয়ে শুনতে হলেও এর অনুষ্ঠানগুলো এখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেরই এক বড় উপাদান হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নামটি যেমন ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক, তেমনি মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত উল্লিখিত অধিকাংশ পত্রিকার নামও ছিল মুক্তিকামী মানুষের মনে সাহস জোগানোর মতো। এখানে এমন কয়েকটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছি। পত্রিকার নাম ছিল 'জয়বাংলা' এটা তো আগেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া পত্রিকার নাম ছিল-গ্রেনেড, হাতিয়ার, বিপ্লবী বাংলাদেশ, দাবানল, রণাঙ্গন, মুক্তি, চাবুক, জাগ্রত বাংলা, রুদ্রবীণা, লড়াই, ওরা দুর্জয়, ওরা দুর্বার, মুক্তিযুদ্ধ, অমর বাংলা, বিপ্লব, স্বাধীনতা, মায়ের ডাক, ইশতেহার, গণমুক্তি, উত্তাল পদ্মা, অগ্নিবীণা, দুর্জয় বাংলা, মুক্তবাংলা, মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীন বাংলা, সংগ্রামী বাংলা ইত্যাদি। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা জীবন বাজি রেখে এইসব পত্রিকা ছাপানো ও মুক্তিকামী মানুষের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন তাদের তৎকালীন মানসিক অবস্থা বোঝানোর জন্য বাছাই করা কয়েকটি নাম মাত্র। এ ছাড়া বিপ্লবী নামের হয়তো আরও অনেক পত্রিকা ছিল যেগুলো সম্পর্কে আমরা এখনো জানতে পারি নি। এ পর্যন্ত গবেষণায় যা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয় বিপ্লবী-সাধারণ নাম নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই ধরনের পত্র-পত্রিকার সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়ে যাবে। যে নামেরই হোক না কেন, এই পত্র-পত্রিকাগুলোর তৎপরতাকেও আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পরিবেশে এ দেশের রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সর্বোপরি জনগণের মন-মানসিকতা নতুন মোড় নিতে শুরু করে। রাজনীতিতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠিত হওয়া, সমাজে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত হাতে অস্ত্র চলে যাওয়া, তরুণদের মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার টানাপোড়েন, সংস্কৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা ও গানের প্রভাব, গ্রুপ থিয়েটারের আবির্ভাবে এক ধরনের মঞ্চ-বিপ্লব, দুর্বল অর্থনীতি এমনকি দুর্ভিক্ষ, বামপন্থী সশস্ত্র গ্রুপের তৎপরতা, বাকশাল গঠন, জাতির পিতার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট পরিবেশ সাংবাদিকতায়ও দারুণ প্রভাব ফেলে। জাসদের পত্রিকা 'গণকণ্ঠ' ও মওলানা ভাসানীর 'হক কথা' অনেকটা সরকারবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। সরকারি নিয়ন্ত্রণে ও মালিকানায় পাকিস্তান আমলের 'দৈনিক পাকিস্তান' 'দৈনিক বাংলা' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

পাকিস্তানের সমর্থক হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন পরিত্যক্ত 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা সরকারি নিয়ন্ত্রণে 'বাংলাদেশ অবজারভার' নামে পুনঃ প্রকাশিত হয়। নতুন ইংরেজি দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস-এরও মালিক ছিলেন সরকার। আওয়ামী লীগের সমর্থক 'বাংলার বাণী' পত্রিকা (যা মুজিবনগর থেকেও প্রকাশিত হতো) এবং আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়' দৈনিক জনপদ' । কিন্তু ১৯৭৪ সালে একদলীয় শাসন (বাকশাল) প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের নতুন-পুরাতন নির্বিশেষে মোট চারটি পত্রিকা রেখে বাকি পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তা ছাড়া এই পত্রিকাগুলো সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তার মধ্যে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় ঘটনা ছিল এই যে, ঐতিহ্যবাহী ইত্তেফাকের মালিকেরাও পত্রিকার মালিকানা হারান।

পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কিছুদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং নানা ধরনের হত্যা, সংঘর্ষ, ক্যু ও পাল্টা ক্যু প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখলে সক্ষম হন এবং বেশ কয়েক বছর ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হন। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় অনুযায়ী এই সময় বেআইনিভাবে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন থাকার কয়েক বছর পর সেনাবাহিনীর একাংশের হাতে জিয়াউর রহমান নিহন হন। তার ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার অল্পদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রায় এক দশক এরশাদ ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। তার ক্ষমতা দখলও বেআইনি ছিল বলে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে।

আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বলতে হলো। নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ পদত্যাগে বাধ্য হলে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে তার তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যথাসম্ভব সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সরকার নির্বাচিত হলে বাংলাদেশের ইতহাসে গণতান্ত্রিক শাসনের এক নতুন যুগের সূচনা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সামরিক শাসনের পরিণামে এ দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে কিছু অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক লক্ষণ পরিলক্ষিত হতে থাকে। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। কেবল বাহ্যিক রাজনৈতিক গণতন্ত্র সমাজকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি দিতে পারে না। এই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে সহনশীলতা ফিরিয়ে আনা দরকার। এ কাজটি কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। এরশাদ-শাসনের পরবর্তী সময়ে হানাহানি এবং অসহনশীলতার পরিবেশের মধ্যেও একাধিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মোটামুটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বেশ কয়েকবার এবং তাতে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলই একের পর এক ক্ষমতাসীন হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এই যে, এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে একটি 'সেনাবাহিনী সমর্থিত' সরকার ক্ষমতায় বসে এবং তারা অনেকটা অনভিপ্রেতভাবেই তিন মাসের পবিরর্তে দুই বছর দেশ শাসন করে।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অনেক নেতিবাচক দিকের পাশাপাশি বেশ কিছু ইতিবাচক দিকও লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, গার্মেন্টস শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ এবং বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর পরিশ্রমলব্ধ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। নেতিবাচকের মধ্যে উল্লেখ করা যায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও মুদ্রাস্ফীতি। এখানে লক্ষযোগ্য যে, প্রথম দুটি অর্জনে কোনো সরকারেরই তেমন বড় কোনো অবদান নেই। পরবর্তী সমস্যাটি সম্পর্কে কোনো সরকারই কিছু করতে পারে নি। ফলে মনে হয়, সরকারের কার্যক্রমের ওপর ভরসা না করে এ দেশে সম্ভবত জনগণকেই নিজের স্বার্থ রক্ষার প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে। তবে ভারত বিভক্তির পর পূর্ববঙ্গ নামক এই অঞ্চলটিতে (যা বর্তমানে সার্বভৌম বাংলাদেশ) অনেক উন্নয়ন যে হয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না। বাংলাদেশের অনেক সম্ভাবনাময় দিকও এখন খুবই স্পষ্ট।

এ দেশের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, এখানে নির্বাচনে পরাজিত কোনো দলই পরাজয় মেনে নিতে চায় না। দুঃখজনক হলেও সত্য, বিরোধীদলের সংসদ বর্জন সংস্কৃতি একটি নেতিবাচক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এগুলোই যেন এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এ দেশের সংবাদ মাধ্যম দুটি বড় দলের বক্তব্য ও কার্যক্রমকেই প্রধানত ফলাও করে প্রচার করে। সাদা চোখে দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সারা দেশের মানুষই যেন এই দল কিংবা ওই দলের সমর্থক। এটা দেশের জন্য কোনো শুভ সংকেত বহন করে না।

বিশেষ করে যখন দেখা যায় যে, এই দলীয় বিভক্তি সাংবাদিকদের মধ্যেও প্রকট। এর ফলে সুষ্ঠু সাংবাদিকতার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে এবং আধুনিক সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্য প্রয়েফসনালিজম গড়ে উঠতে পারছে না। তদুপরি সাংবাদিকতায় দুর্নীতি ঢুকেছে বলে অনেক মহল থেকেই অভিযোগ উঠেছে। সাংবাদিক মহলের উচিত হবে নিজেদের স্বার্থেই এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই লেখাটি আর বড় করতে চাচ্ছি না। এখন ইতি টানার পালা। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে দেশের ইতিবাচক দিকগুলোর তুলনায় নেতিবাচক দিকগুলোই যেন এই লেখায় বেশি দৃশ্যমান হয়ে গেছে। কিন্তু এই দেশটাকে যে আমরা বড় বেশি ভালোবাসি। এই বিশ্বায়নের যুগেও অত্যন্ত সসংকোচে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, দেশ ছেড়ে দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার ব্যাপারটি এখনো আমি পছন্দ করে উঠতে পারি নি। তবে কী আছে আকর্ষণ এই মাটির, এই পরিবেশের তা হয়তো প্রশ্ন করলে ভাল উত্তর দিতে পারবোনা। এই অনুভূতি সম্ভবত যুক্তির ধার ধারে না।

তাই ভাবলাম, শেষ করার আগে এই দেশের ভালো দিক বা ইতিবাচক দিকগুলোর একটি তালিকা করার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়। আমাদের এককালের দেড় লাখ লোকের ঢাকা শহর এখন দেড় কোটি লোকের মেগাসিটিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের মতো পশ্চাৎপদ সমাজে আমরা এমন দুজন নারীকে পেয়েছি, যারা দেশকে দীর্ঘদিন যাবৎ নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং সম্ভবত আরও দেবেন। এ দেশে আবিস্কৃত হয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস যা সমাজের নানা ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়ন বয়ে নিয়ে এসেছে। মনে আশা, আরও গ্যাসক্ষেত্র খুঁজে পাব আমরা। এদেশের মাটির নিচে বিপুল পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা রয়ে গেছে। এই কয়লা উত্তোলন ঘিরে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এগুলো কাজে লাগাতে পারলে জ্বালানি ঘাটতির অনেকটাই সুরাহা করা যাবে। প্রচুর সূর্যালোকের এই দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়তো কেবলই সময়ের ব্যাপার। গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের কথা আগেই বলা হয়েছে, এই শিল্পে নিয়োজিত ত্রিশ লাখ নারীর অংশগ্রহণের পরিণামে সামাজিক পবিরর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রবাসীদের অর্জিত আয়ের কথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানত তাদের আয়েই এখন শহরাঞ্চল ছাড়াও গ্রামে-গঞ্জে পর্ণকুটিরের পরিবর্তে নতুন নতুন পাকা বাড়ি-ঘর গড়ে উঠছে। বলতে গেলে গ্রামের চেহারাই পাল্টে যাচ্ছে। অতীতের সব সরকারের আমলেই দেশে নতুন রাস্তা-ঘাট-সেতু, স্কুল-কলেজ তৈরি হয়েছে, বিপুলসংখ্যক গ্রামে বিদ্যুৎ চলে গেছে। কৃষিকাজে বিদ্যুতের ব্যবহার এখন দেশে সাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) সাফল্য এখন বিদেশেও প্রশংসিত হচ্ছে। অশিক্ষিত দরিদ্র মেয়েরাও দুটি সম্ভাব্য রোগ প্রতিরোধের জন্য শিশুদের কোলে নিয়ে টিকাদান কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যায় হাজির হচ্ছেন। বিদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীতে কাজ করে পৃথিবীতে সংখ্যার দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এই বাহিনীতে পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই বাহিনী আশাতীত সুনাম অর্জন করেছে। ভারত ভাগের আগে কলকাতা বন্দরের ওপর নির্ভরশীল পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চলেই এখন গড়ে উঠেছে দুটি আন্তর্জাতিক মানের সমুদ্র বন্দর। তার মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরটি গভীর সমুদ্র বন্দরে রূপান্তরিত করে বিশ্বের এই অঞ্চলের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনাময় বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর দেশে এখন বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির পাশাপাশি শ্রমিকের মজুরিও বাড়ছে। এখন আর না খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে বলে শোনা যায় না। বছরের বিশেষ সময়ে উত্তরাঞ্চলে প্রায় স্থায়ী হয়ে যাওয়া 'মঙ্গা' এখন আর নেই বলেই খবর পাওয়া যাচ্ছে। যমুনা সেতু নির্মিত হয়ে উত্তরাঞ্চলের জনজীবন ও অর্থনীতিতে এনেছে নুতন জোয়ার, আর স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন বাস্তবায়নের পথে। খাদ্য উৎপাদনে দেশ এখন প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। রপ্তানি ধীরে হলেও বাড়ছে। রাজনীতিতে দু'দলীয় ব্যবস্থা অনেকটাই কায়েম হয়েছে। কোন্দল কমিয়ে অপেক্ষকৃত সহনশীল পরিবেশে এই ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারলে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ আশা করা যায়। আর রাজনৈতিক অস্থিরতা কমলে বাংলাদেশের মতো সম্ভাবনাময় দেশে বাইরের পুঁজি আসতে থাকা এবং নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠা অবধারিত-এ কথা যুক্তিসঙ্গতভাবেই উচ্চারিত হচ্ছে। দেশে পরিপূর্ণভাবে না হলেও এক ধরনের সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিস্ময়কর সম্প্রসারণ ঘটেছে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, গণমাধ্যমের সংখ্যার দিক দিয়ে এই 'বিস্ফোরণ' এক সময় স্থিতিশীল হয়ে দায়িত্ববান ও দেশপ্রেমিক সাংবাদিকতার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গণমাধ্যমের মধ্যে যারা সুষ্ঠু সাংবাদিকতা ও বিনোদনের পরিবর্তে অন্য কোনো মতলব হাসিলের জন্য এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, তারা তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণেই অনিবার্যভাবে ঝরে পড়বে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সত্ত্বেও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কোথাও কোথাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজে বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষা সঠিকভাবে শেখার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। দেশে সবজি উৎপাদন ও মাছ চাষে শিক্ষিত মানুষেরা এগিয়ে আসছেন। বিশেষ করে তরুণ সমাজ ব্যবসায়ে উৎসাহিত হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পসহ নানা নতুন ধরনের শিল্প স্থাপনে তরুণ সমাজের এমনকি নারীদেরও অংশগ্রহণ এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করছে। দেশে যথেষ্ট সংখ্যায় কমিউনিটি রেডিও স্থাপিত হলে তা সুস্থ ও গতিশীল সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

এই তালিকা আর বাড়াতে চাই না। হয়তো আলোচনায় দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ অংশ বাদ পড়ে গেছে। তবে সবশেষে বলব, আমাদের এই জাতির সম্ভবত সবচেয়ে বড় পাওয়া ছিল মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা। লাখো প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই জাতি বিশ্বসভায় মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অনুপ্রেরণা থেকেই। এ কথাটি আমাদের কোনোদিন ভুলে গেলে চলবে না।

অধ্যাপক (সুপারনিউম্যারারি), গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রধান উপদেষ্টা, ডিইউএমসিজেএএ।

গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম: আন্ত:সম্পর্কের গতিধর্ম

রোবায়েত ফেরদৌস

"ভক্স পপুলি ভক্স ডাই"
(জনগণের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর)
– ল্যাটিন প্রবাদ

জ্যামিতির মতো গণতন্ত্রেরও সহজ সড়ক নেই; গণতন্ত্রের পথে কোনো রাষ্ট্রের পথচলা কখনোই একরৈখিক নয়, সবসময়ই তা আঁকা-বাঁকা–দুস্তর আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ; এ এক দীর্ঘ আর কষ্টকর ভ্রমণ–যার পথে পথে পাথর ছড়ানো। গণতন্ত্রের আত্মম্ভর আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে রাষ্ট্রকে দু পা সামনে তো এক পা পেছনে চলতে হয়। অগণতান্ত্রিক, প্রাচীন, সামন্ত বা সামরিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পেছনে মাড়িয়ে রাষ্ট্রকে আয়াসসাধ্য ভ্রমণে নামতে হয়–লক্ষ গণতন্ত্রে নোঙর গাড়া। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের উপস্থিতি, সুষ্ঠু নির্বাচন, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, সাংবিধানিক চর্চার ধারাবাহিকতা, জবাবদিহিতা, চিন্তার বহুত্ববাদিতা–যা গণতন্ত্রের অন্যতম নিদান–একটি রাষ্ট্রে তার সঠিক চর্চা নিশ্চিত করা মোটেই সহজ কোনো বিষয় নয়। গণতন্ত্রেরই আরেক অনুষঙ্গ মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বলা হয় গণতন্ত্রের জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। কেন বলা হয়? গণতন্ত্রের সঙ্গে গণমাধ্যমের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কোথায়? গণমাধ্যম কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, না গণতন্ত্রই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে? গণমাধ্যম গণতন্ত্রকে অনুসরণ করে না নেতৃত্ব দেয়? আবার এ প্রশ্নও তো বেশ যুৎসই যে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আসলে কী? কিংবা একটি রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক তাই-বা মাপা হবে কোন গজকাঠিতে? গণমাধ্যমের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্কের বিষয়টি দু'শ বছর ধরে আলোচনা-সমালোচনা-পর্যালোচনায় এলেও ধারণা-নিচয়টি এখনও বেশ গোলমেলে। একেক গোষ্ঠী–সরকার, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ আর রাজনীতিকগণ– নিজ নিজ কাঠামোয় ফেলে এর ব্যাখ্যা-বয়ানের চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্র একভাবে আবার এর নাগরিকরা অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন। উদারপন্থি আর রক্ষণশীলদের মধ্যেও এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। বিরোধ আছে অ্যাকাডেমিশিয়ান আর প্র্যাকটিশনারদের মাঝেও।

প্রতীতি বলে, গণমাধ্যমের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক বিচারে রাষ্ট্রীয় চরিত্র, গণমাধ্যমের মতাদর্শ ও মালিকানার কাঠামো বিশ্লেষণ জরুরি। রাষ্ট্র যদি সামরিক হয় তবে গণমাধ্যম চাইলেও মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। যেমনটি আমরা এরশাদের সামরিক শাসনামলে সাংবাদিক নির্যাতন বা বিরোধী চিন্তার পত্রিকা বন্ধের মধ্যে পরখ করেছি। ৫০/৬০-এর দশকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সামরিক সরকারগুলোর এরকম চর্চার কথা আমরা জানি। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যম তখন ব্যবহৃত হয়েছে সামরিক/স্বৈরশাসকের ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রচারযন্ত্র হিসেবে। আবার চীন বা উত্তর কোরিয়ার মতো রাষ্ট্র–যেখানে একদলীয় শাসনব্যবস্থা বর্তমান গণমাধ্যম সেখানে তীব্র নিয়ন্ত্রণে আছে; যেমনটি আমরা বাকশালের সময় বাংলাদেশেও লক্ষ্য করেছি চারটি রেখে বাকি সংবাদপত্র তখন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরে থেকেও মতাদর্শগত কারণে গণমাধ্যম অ-গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশকে উৎসাহিত করতে পারে। ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর মালিকানায় যে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা পায় তা কিন্তু নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা, নির্বাচন, ধর্মীয় সমালোচনা কিংবা বহু ধর্মের চর্চার মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কাজেই বিষয়টি সরল না যে গণমাধ্যম গণতন্ত্রকে সংহত করে, অনেক সময় গণমাধ্যম গণতন্ত্রকে নস্যাতও করে। এটাই এক প্যারাডক্স যে, গণতন্ত্রের সুবিধা নিয়ে কেউ খোদ গণতন্ত্রকেই বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তবে যা নিয়ে তর্ক নেই তা কোনো রাষ্ট্র যদি নিজেকে গণতান্ত্রিক দাবি করে তবে সেখানে গণমাধ্যমের একশ ভাগ স্বাধীনতা থাকতেই হবে; এতে আরেকটি প্যারাডক্স জন্ম নেয়–যে গণমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করবে, যে সাংবাদিক সরকারের ভুলচুক নিয়ে নিয়ত রিপোর্ট করবে, সেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা সেই সাংবাদিকের নিরাপত্তা আবার সেই সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। অনেকটা সংসদে বিরোধি দলের অবস্থানের মতো, তারা সংসদে সরকারের কাজের সমালোচনা বা বিরোধিতা করবে, তারা যেন সংসদে তা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, সেই সুযোগ সরকারি দলকেই নিশ্চিত করতে হবে।

তো গণতন্ত্রের পথচলায় গণমাধ্যম কী করতে পারে? গণমাধ্যম নাগরিকদের বহুমুখীণ যোগাযোগের পাটাতনটি তৈরি করে দেয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানে যেহেতু খোলা সমাজ, তাই মানুষকে এখানে বহু স্তরে বহু পর্যায়ে বহু ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করতে হয়। গণমাধ্যম মানুষের জন্য তথ্যের বৃহত্তর প্রবেশগম্যতা তৈরি করে। সরকারকে চোখে চোখে রাখার মধ্য দিয়ে 'গণতন্ত্রের প্রহরী'র ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম পাবলিক ডিবেট উস্কে দেয়, পলিসি এজেন্ডা নির্ধারণ করে, নাগরিক মতামতের ফোরাম তৈরি করে–যেখানে জনগণ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে তাদের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। দুর্নীতির ওপর সার্চলাইট ফেলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা নির্মাণ করে। অমর্ত্য সেন যেমন বলেছেন রাষ্ট্রে গণমাধ্যম স্বাধীন হলে এমনকি ঠেকিয়ে দেওয়া যায় দুর্ভিক্ষও। অজ্ঞতা ও ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি না করে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারে–সচেতন ভোটাররা তখন খারাপ শাসককে ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে পারে। গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত জনপরিসর বাড়িয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে সেতু গড়ে। প্রতিদিনের রাজনৈতিক ইস্যু/বিতর্ক তুলে ধরে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি মনিটর করে। বহু স্বার্থ, বহু কণ্ঠস্বর তুলে ধরে। সরকারের কাজের রেকর্ড, তাদের মিশন-ভিশন, নেতাদের পারঙ্গমতা তুলে ধরে। শাসনপ্রক্রিয়ায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণকে সম্ভব করে তোলে।

ডিসকোর্স হিসেবে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা' নিয়ে কথা পাড়লেই কয়েকটি বিষয় হাতধরাধরি করে উঠে আসে; এবং বলা বাহুল্য যে উঠে আসা বিষয়গুলো পরস্পর আন্তঃসম্পর্কিত। মোটা দাগে, আমার বিবেচনায়, বিষয়গুলো এক. রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সুযোগের বণ্টনব্যবস্থা–যার ওপর নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রে ব্যক্তিমানুষের ক্রয়ক্ষমতা দুই. রাষ্ট্রে ভাব বা মতপ্রকাশের সুযোগ ও স্বাধীনতা কতটা চর্চিত হয় তার সামাজিক প্রকৃতি ও আইনি কাঠামো তিন. শিক্ষিতের হার চার. তথ্য উৎপাদন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনগণের প্রবেশাধিকারের মাত্রা পাঁচ. জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মান ইত্যাদি। স্পষ্ট করে বললে বিশ শতকের আগে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি ছিল আন্দোলন বা অধিকার হিসেবে 'স্বীকৃতি আদায়ের' বিষয়। কারণ চরিত্রগত দিক দিয়ে রাষ্ট্র তখন স্বৈরতান্ত্রিক ছিল। জনসমক্ষে নিজের মতামত মুক্তভাবে প্রকাশ করাটাই তখন মুখ্য ছিল। এর একটি দার্শনিক ভিত্তিও রয়েছে। জন মিল্টন থেকে লক কিংবা ম্যাডিসন থেকে স্টুয়ার্ট মিল বাক্-স্বাধীনতার পক্ষে বিস্তর যুক্তির বিস্তার ঘটিয়েছেন। যে কারণে মত বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে সেই সপ্তদশ শতকে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে লড়াইয়ে মেতে উঠেছিলেন ইংরেজ কবি মিল্টন। কবি চেয়েছিলেন বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বায়ত্তশাসন। অ্যারিওপ্যাজিটিকায় তার উচ্চারণ ছিল এই রকম : দাও আমায়, জ্ঞানের স্বাধীনতা দাও, কথা কইবার স্বাধীনতা দাও, মুক্তভাবে বিতর্ক করার স্বাধীনতা দাও। সবার ওপরে আমাকে দাও মুক্তি। কিন্তু দুঃখজনক যে কবি-কাঙ্ক্ষিত বিবেকের মুক্তি এবং শর্তহীন বাক-স্বাধীনতার বিষয়টি আজও আমরা অর্জন করতে পারিনি। তবে জরুরি যে প্রশ্নটি থেকে যায়, তা এই যে স্বাধীনতা চাওয়া হয়েছিল, সেটা কার কাছ থেকে? স্বাধীনতা চাওয়া হয়েছিল চার্চ ও রাষ্ট্র থেকে–কারণ ক্ষমতার বিলিবণ্টন তখন এ দুটো প্রতিষ্ঠানই করত; এই ক্ষমতাকেন্দ্র দুটো তখন সমার্থক ছিল। তারাই সব নিয়ন্ত্রণ করত–দেহ, দেহের খোরাক এবং আত্মাও। আঠারো শতকের শেষ পাদে পশ্চিমের প্রেক্ষাপটে ভাব প্রকাশ বা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সংবাদপত্র একটি বড় ভূমিকা রাখে। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে তখন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় বা মতাদর্শগত বিতর্ক তোলার ক্ষেত্রটি তৈরি হয়। মিডিয়া-ফিলসফার য়ুর্গেন হেবারমাস তার জনপরিসর তত্ত্বে এ বিষয়ে একটি জরুরি তর্ক তোলার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস ঘেঁটে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে আঠারো শতকে ইউরোপে সেলুন ও কফি হাউসে নিয়মিত আড্ডা, যেখানে সমবেতরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে মুক্ত আলোচনা করতেন কিংবা জম্পেশ বিতর্কে মেতে উঠতেন। এখানে সংবাদপত্র ও জার্নাল পড়া আড্ডার এজেন্ডা নির্ধারণে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। বাধাহীনভাবে সমাজের তাবৎ বিষয় নিয়ে মুখোমুখি কথা বলার ক্ষেত্রে, হেবারমাসের ভাষায়, এসব স্পেস ছিল আদর্শ ফোরাম, যাকে তিনি বলেছেন 'বুর্জোয়া জনপরিসর'। এ ধরনের জনপরিসর চার্চ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, নীতিগতভাবে এখানে প্রবেশাধিকার সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। এসব জায়গা এমনকি অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যবসায়ী শ্রেণীর সম্পর্ক পাল্টে দিতেও ভূমিকা রেখেছে। হেবারমাসের ধারণা, আঠারো শতকে সংবাদপত্র ও সাময়িকী 'জনপরিসর'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পরে, হেবারমাস আক্ষেপ করেন, সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলো বিজ্ঞাপন ও পণ্যবাণিজ্যের খপ্পরে পড়ে যায়; গণভোক্তা ও গণবণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলে; ফলে জনগণের স্বার্থে সমাজের সত্যিকার ইস্যু নিয়ে আলোচনার এজেন্ডা যোগাতে ব্যর্থ হয়; তারা বরং যেকোনো প্রকারে কাটতি বাড়ানোর দিকে ঝুঁকে যায় এবং তাদের আধেয় নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞাপনদাতা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো বড় ভূমিকা রাখতে থাকে। এভাবে জনপরিসর সংকুচিত হতে থাকে।

তবে গণতন্ত্র যে গণমাধ্যম বিকাশে সহায়ক তার প্রমাণ ৯০-এর পরে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ। নব্বুই-এর গণঅভ্যুত্থানের পরে, ধরে নেওয়া হয়, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হতে থাকে এবং তখন থেকেই সংখ্যার দিক থেকে গণমাধ্যমের বিস্ফোরণ শুরু হয়। সামরিক শাসনের বিদায়, গণতান্ত্রিক সরকারের দেশ পরিচালনা, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হিসেবে বিরাষ্ট্রীয়করণকে স্বাগত জানানো এবং রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক প্রেস ও পাবলিকেশন অ্যাক্ট ১৯৭৩ সংশোধনই এর প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি। ডিএফপির ১৯৯৩ সালের উপাত্তে দেখা যায় ওই সময় ডিএফপির তালিকায় সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৩শ পঁচিশটি কাগজ! ১৯৯৮ সালে এ সংখ্যা ৯০৮-এ নেমে আসে এবং ২০০১-এ আবার বেড়ে হয় ৯৯০। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে দেশে বেশি প্রচারসংখ্যার বেশিরভাগ সংবাদপত্রই নব্বুই-এর দশক এবং এর পরে প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রের সর্বত্র বাজার উদারিকরণের বিষয়টি গতিপ্রাপ্ত হলে গণমাধ্যমও এ দৌড় থেকে পিছিয়ে থাকে না। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র দৈনিক বাংলা বন্ধ করে দেয় এবং সাময়িকী বিচিত্রা ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়। এরপর দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কেবল দুটি গণমাধ্যম টিকে থাকে–বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার। যদিও নব্বুই-এর আন্দোলনে তিন জোটের রূপরেখায় রাষ্ট্রীয় এ দুটো গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নির্বাচিত কোনো সরকারই জনগণের এ দাবির প্রতি সম্মান দেখাননি। রাষ্ট্রীয় এ দুটো মাধ্যম এখনো দলীয় আদর্শ প্রচারের যন্ত্র হিসেবেই কাজ করে চলেছে; এখানে সংবাদমূল্যের চেয়ে প্রটোকল মূল্যই বেশি প্রাধান্য পায়। বিবিসি বা জাপানের এনএইচকে'র আদলে 'পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' (পিবিএস) হিসেবে গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই আমরা আর দেখি না। এবং যে কারণে জনগণের কাছে এ দুটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ/মতামতের বিশ্বাসযোগ্যতা সব সময়ই প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাচ্ছে। সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিকাশেও বিরাট ভূমিকা পালন করে। ১৯৯০ সালের আগে দেশে কোনো বেসরকারি টিভি চ্যানেল ছিল না। ১৯৯০ সালে বিদেশি ক্যাবল টিভি চালু হয় এবং তা দ্রুত অডিয়েন্সপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিএনপিসহ প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে মুক্ত, স্বাধীন জাতীয় গণমাধ্যম বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির কথা বলে। ১৯৯৯-এর শেষে ব্যক্তিমালিকানা পর্যায়ে প্রথম টিরেস্ট্রিয়াল টিভি একুশে টিভি চালু হয়।

দেশে বর্তমানে ১২টি টিভি চ্যানেল আছে আরও প্রায় এক ডজন মুখিয়ে আছে সম্প্রচারের অপেক্ষায়। জনগণের সংবাদ/মতামত জানার প্রধান সোর্স এখন এইসব টিভি চ্যানেল। বেতার প্রসঙ্গে বলা যায়, ১৯৯০-এর আগে বাংলাদেশ বেতার ছাড়া অন্য কোনো রেডিও স্টেশন ছিল না; ৯৯'র মাঝামাঝিতে রেডিও মেট্রোওয়েভ নামে প্রথম বেসরকারি রেডিও চালু হয়। ২০০৫-এ আরো কয়েকটিকে এফএম রেডিও হিসেবে চালুর অনুমতি পায় রেডিও টু ডে, রেডিও ফূর্তি, রেডিও আমার; এরও পরে যোগ হয় এবিসি রেডিও। তরুণ ও শহুরে শ্রোতাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

এখানে যে বিষয়টি খেয়ালে রাখা দরকার তা বাংলাদেশে দু দশকে গণমাধ্যমের মালিকানার ধরন কিন্তু পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এখন আর কোনো ব্যক্তি বা একক সংস্থা নয়, রেডিও টিভি বা সংবাদপত্রের মালিক হচ্ছেন কোনো দলীয় ক্যাডার, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী বা গ্রুপ অব কোম্পানিজ। পশ্চিমের মতো একই হাউজ থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক আর টিভি চ্যানেল বের হচ্ছে। 'মহান' পেশায় অবদান রাখা বা সমাজ উন্নয়নের চিন্তা নয় বরং মুনাফা অর্জন, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ কিংবা কোম্পানির অন্য ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এখন কাগজ বেরুচ্ছে, টিভির চ্যানেল গজাচ্ছে। গণমাধ্যম নিজেই পরিণত হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিতে। তবে যে বিষয়টি দুঃখজনক তা আমরা দেখছি, মিডিয়ার মালিকানা চলে যাচ্ছে মাস্তান, দুর্নীতিবাজ, কালো টাকার মালিক আর দুষ্ট লোকদের হাতে। 'নষ্ট' রাজনীতিক আর 'দুষ্ট' ব্যবসায়িরা তাদের ব্যবসায়িক আর রাজনৈতিক স্বার্থে সংবাদপত্র আর টিভি চ্যানেলের মালিক হচ্ছেন। আমরা বলেছি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মিডিয়ার কাজ সরকার ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে চোখে চোখে রাখা, তাদের ভুলচুক-ত্রুটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। মানুষ প্রত্যাশা করে সরকারি, বেসরকারি, বহুজাতিক বা ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠান–যাদের কাজের সঙ্গে জনগণের স্বার্থ জড়িত গণমাধ্যম তাদের কাজের ওপর নজরদারি রাখবে, জনবিরোধী বা কোনো অন্যায় অনিয়ম দুর্নীতি হলে সেসবের সমালোচনা করবে। মিডিয়াকে তাই 'আই অন গভর্নমেন্ট' বলে। কিন্তু বাংলাদেশে মিডিয়ার মালিকদের এই যদি হয় অবস্থা, তারা নিজেরাই যদি আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকেন, তাহলে কী করে তারা অন্যের কাজের সমালোচনা করবেন। মহাভূত সে তো সর্ষের ভেতরেই। যে মিডিয়ার মালিক নিজেই গডফাদার সেজে বসে আছে, সরকার বা অন্যের কাজের সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার তো সেই মিডিয়ার থাকে না। বাংলাদেশে রাজনীতি যেমন পচে গেছে, মিডিয়াও তেমনি পচে যাচ্ছে। রাজনীতির মতো, মিডিয়ার মালিকানাতেও তাই গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। কালো টাকার মালিক, নষ্ট ব্যবসায়ী আর দুষ্ট রাজনীতিকদের খপ্পর থেকে মিডিয়াকে বাঁচাতে হবে।

২০০৮ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি থেকে রেহাই পেতে, তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক-সামরিক কোয়ালিশন সরকারের শ্বাস-বন্ধ-করা-গুমোট অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মানুষ ভোটবিপ্লব ঘটায় এবং বিপুল সমর্থন দিয়ে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় হাজির করে। আশা ছিল দেশে মুক্তচিন্তার পরিবেশটি তার কাঙ্ক্ষিত পরিসর খুঁজে পাবে। বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় সাংবাদিকদের ওপর যে হামলা-মামলা হত্যা-নির্যাতন হয়েছে তার অবসান হবে, তত্ত্বাবধায়ক-সামরিক কোয়ালিশন সরকারের জরুরি অবস্থার সময় সংবাদপত্র ও টিভি তথা মত প্রকাশ ও প্রেসের স্বাধীনতাকে যেভাবে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল তা থেকে জাতির উত্তরণ ঘটবে। কিন্তু সংসদের সদ্য-সমাপ্ত অধিবেশনে সাংসদগণ পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া এবং সংসদে সম্পাদকদের তলব করার দাবি জানিয়েছেন। আইনপ্রণেতারা জাতীয় সংসদে যে ঢালাও অভিযোগ এনেছেন, তা সংবাদমাধ্যম ও সংবাদকর্মীদের প্রতি হুমকি ছাড়া কিছু নয়। অথচ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক, বিপরীতমুখী নয়। টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো অবস্থায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না। আবার সংবাদমাধ্যমকেও তার বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা বজায় রাখতে হবে। আমরা মনে করি, সংবাদমাধ্যমের সমালোচনাকে বৈরী হিসেবে দেখা ঠিক নয়। গণতন্ত্রের বিকাশে ভিন্নমত পোষণের পূর্ণ সুযোগ থাকতে হবে। সংবাদমাধ্যমকে প্রতিপক্ষ না ভেবে সাংসদেরা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন–সেটাই দেশবাসী প্রত্যাশা করে। এর আগে চ্যানেল ওয়ান ও আমার দেশ বন্ধের যে সিদ্ধান্ত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নেয় তা আমাদের যারপরনাই হতাশ করেছে। চারটে কাগজ/তিনটে চ্যানেল সরকারের সমালোচনা করলে কী এমন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়? গণতন্ত্রের জন্য সমালোচনা সবসময় সহায়ক–সরকারের মনোজগতে এই সংস্কৃতিকে ঠাঁই দিতে হবে। তবে মনে রাখা দরকার, প্রেসের স্বাধীনতা মানে হাত-পা খুলে যা-খুশি রিপোর্ট করা নয়, প্রকাশিত রিপোর্টকে অবশ্যই সত্য, যথার্থ আর পক্ষপাতহীন হতে হবে। অনেস্টি, অ্যাকিউরেসি আর ফেয়ারনেস হচ্ছে সাংবাদিকতার মৌল তিন নীতি–যার ওপর দাঁড়িয়ে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার চর্চাটি হয়ে থাকে। তাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা জারি রাখার জন্য যেমন সদা সোচ্চার থাকতে হবে তেমনি দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পথে আমাদেরকে আরো অনেক দূর অবধি যেতে হবে; যেতে হবে গণতন্ত্রকে সতেজ টাটকা আর ফুরফুরে রাখার তাগিদে।

রোবায়েত ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
E-mail : robaet.ferdous@gmail.com

১৬ মিনিট নাটকে ২৫ মিনিট বিজ্ঞাপন এবং বেসরকারি সম্প্রচার নীতিমালা

ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ
রফিকুজজামান

বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের মালিকানার ধরনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সময়ে দেশের গণমাধ্যম শিল্পে দুটি নতুন ধারাও বিকাশ লাভ করেছে। 'সনাতন' ধারা থেকে বের হয়ে এসেছে প্রিন্ট মিডিয়া তথা সংবাদপত্র। আর বিটিভি কেন্দ্রিক ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার বলয় ভেঙে উদ্ভব হয়েছে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা বেসরকারি সম্প্রচার মাধ্যম। ইতিমধ্যেই আরো কিছু আগে অবশ্য বাংলাদেশ একটি 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্র মানে বাক-স্বাধীনতা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার শিহরণ থেকেই হয়তো একে একে জন্ম নিয়েছে 'স্বাধীন' সংবাদমাধ্যম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু মতামত প্রকাশেরই স্বাধীনতা থাকে না; থাকে মতামত প্রকাশের 'জায়গা' দখল কিংবা সৃষ্টির স্বাধীনতাও। ফলে এই স্বাধীনতা একদিকে যেমন দেশের গণমাধ্যমের ইতিবাচক বিস্তৃতি ঘটিয়েছে, তেমনি গণমাধ্যমের মালিকানায়ও এনেছে প্রশ্নবোধক পরিবর্তন। দেশ যত 'গণতান্ত্রিক' হয়েছে, 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র সুবিধাভোগীরা ততই 'রাজনৈতিক' হয়েছেন। তাই জনগণ নয়; এখনকার গণতান্ত্রিক ক্ষমতার মূল উৎস এই রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political economy), বলতে দ্বিধা নেই, এই রাজনৈতিক অর্থনীতির মিথষ্ক্রিয়ায় মিডিয়া এখন নির্লজ্জভাবে অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এক একটি মিডিয়া হাউস যেন কোনো বহুজাতিক কোম্পানির এক একটি কর্পোরেট অফিস। মিডিয়ার সম্পাদক হচ্ছেন কোম্পানির প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা (Public relations officer), কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের মুখ্য প্রচার সম্পাদক।

মিডিয়াকে ব্যবহার করে 'রাজনীতি উদ্ধারের' অশুভ উদ্যোগের পেছনে রাজনীতি নিজেই হয়তো দায়ী। কারণ রাজনীতি একটি ক্ষমতার নাম। ক্ষমতার কাছে মিডিয়া অসহায়। কিন্তু মিডিয়া 'অর্থনীতি উদ্ধারের' হাতিয়ারে পরিণত হলে "এথিক্স ইন জার্নালিজম" ভূলুণ্ঠিত হয়, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ খসে পড়ে। গণমাধ্যমের মূল চারটি কাজ জনগণকে তথ্য দেয়া (to inform), শিক্ষা দেয়া (to educate), প্রভাবিত করা (to persuade), এবং বিনোদিত করা (to entertain); এগুলো করতে গেলে সবার আগে গণমাধ্যমকে টিকে থাকতে হবে (to survive); টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন অর্থ। বিজ্ঞাপন সেই অর্থের অন্যতম যোগানদাতা। সুতরাং বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কিন্তু বিজ্ঞাপন আর তার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনই যখন কোনো গণমাধ্যমের মৌলিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়, তখনই বিজ্ঞাপন হয়ে যায় 'ব্যবসা উদ্ধারের' হাতিয়ার। এটিই বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর সময়ের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম।

অথচ কী চমৎকার একটি শিল্প এই বিজ্ঞাপন! যদিও বিজ্ঞাপনের বিশ্বাসযোগ্যতা (Credibility) নিয়ে নেতিবাচক অনেক মন্তব্য রয়েছে। তবু এর শৈল্পিক মান অসাধারণ! বিখ্যাত যোগাযোগ তত্ত্ববিদ মার্শাল ম্যাকলুহান তো বলেই দিয়েছেন, "Advertising is the greatest art form of the 20th century". বিজ্ঞাপন হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর শিল্পকর্ম। কিন্তু আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলোর অতি-বাণিজ্যিকিকরণ এই শিল্পটিকে মহাবিরক্তির কারণ বানিয়ে ফেলেছে। বিজ্ঞাপন তার দর্শক হারাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। টিভি চ্যানেলগুলোর মাত্রাতিরিক্ত বিজ্ঞাপন প্রচারে দর্শক বিরক্ত। এক চ্যানেলে বিজ্ঞাপন শুরু হওয়া মাত্রই সে চলে যায় অন্য চ্যানেলে। কখনো কখনো একই সময়ে সবগুলো চ্যানেলেই চলে বিজ্ঞাপন। ফলে বিজ্ঞাপন আজ আর দর্শকের কাছে শিল্প নয়; পুরোদস্তুর এক বিরক্তির নাম। ঢাকাই চ্যানেলগুলোর বিজ্ঞাপন প্রচার নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি জনমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বলা হয়, আগে অনুষ্ঠানের মাঝে বিজ্ঞাপন প্রচার করা, এখন বিজ্ঞাপনের মাঝে প্রচার করা হয় অনুষ্ঠান! এটি মোটেই অত্যুক্তি নয়। প্রমাণ আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।

২১ মে ২০১১, শনিবার। চ্যানেল বাংলাভিশন। সময় রাত ৮ টা ১৪। শুরু ধারাবাহিক নাটক 'লেডিস ফার্স্ট'। (নাটকের নাম 'লেডিস ফার্স্ট! ইদানিংকার ঢাকাই নাটকের নামকরণ শুদ্ধতা, রুচিশীলতা, সৃজনশীলতার কাছ দিয়েও হাঁটে না। নাট্যকাররা কোনো কাহিনী তো দিতে পারছেনই না, একটি ভালো নাম দেয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায় ভয়াবহ রকমের দীনতা। অবশ্য যে নাটকের কোনো সুনির্দিষ্ট কাহিনীই নেই, সেই নাটকের নামকরণ দিয়ে কী আসে যায়! তবু পাঠককে বাংলা নাটকের নামগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছি, নাটকের নাম ঘটক বাকী ভাই, ফ্লেক্সিলোড, ২ টাকা মিনিট, সিট খালি নাই, ফোর টুয়েন্টি, বয়রা পরিবার, বাক বাকুম পায়রা, বাটপার, বিজি ফর নাথিং, ম্যাড ভাই....)। ৮ টা ১৪ থেকে ১৭ পর্যন্ত চলল অভিনয়শিল্পীদের নাম দেখানো ও ফিরে দেখা। ৮ টা ১৮তে শুরু হলো নাটকের ১৭তম পর্ব। ৮ মিনিট নাটক দেখানো। ৮টা ২৬-এ শুরু প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতি। বিজ্ঞাপন চলল ১৪ মিনিট। ৮ টা ৪০-এ আবার নাটক শুরু। চলল ৬ মিনিট। ৮ টা ৪৬-এ আবার বিজ্ঞাপন। চলল ১১ মিনিট। ৮ টা ৫৭তে পুনরায় নাটক শুরু। ২ মিনিট পর ৮ টা ৫৯-এ নাটক শেষ। প্রিয় পাঠক, এবার আসুন আমরা হিসাব করে দেখি। মোট নাটক দেখানো ৮+৬+২= ১৬ মিনিট। বিজ্ঞাপন প্রচারিত ১৪+১১ = ২৫ মিনিট।

১৬ মিনিটের নাটকে ২৫ মিনিট বিজ্ঞাপন! দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, সুধী দর্শক, আপনাদের জন্য আমাদের এবারের আয়োজন বিজ্ঞাপনমালা। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক 'লেডিস ফার্স্ট'-এর সৌজন্যে।

এটি কোনো গবেষণা নয়। তবু গবেষণার ভাষায় বলতে গেলে এখানে বাংলাভিশনকে নেওয়া হয়েছে বিচ্ছিন্ন নমুনায়নের (Random selection)-এর মাধ্যমে। প্রায় সবগুলো চ্যানেলের অবস্থাই এমন। এনটিভি, এটিএন বাংলা, আরটিভি, চ্যানেল আই, একুশে টিভি কোনো চ্যানেলের কোনো অনুষ্ঠানই নির্ধারিত সময়ে শুরু হয় না বিজ্ঞাপনের আধিক্যের কারণে। অতিসম্প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্প্রচারে আসা মাছরাঙা টেলিভিশন তো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েই জানান দিচ্ছে তারা কম বিজ্ঞাপনে বিশ্বাসী "সীমিত বিজ্ঞাপন বিরতি ও নির্ধারিত সময়েই উপভোগ করুন মাছরাঙার প্রতিটি অনুষ্ঠান!" খবরের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামের মধ্যেও বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। নীতিমালা নেই। লাগামহীন এক অবস্থা। হাতে গোনা দু'চারটি অনুষ্ঠান ছাড়া বাংলা চ্যানেলগুলোর দর্শক দিন দিন কমে যাচ্ছে। মানহীন অনুষ্ঠানের কারণে এবং অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনের কারণে। বিরক্ত দর্শক বিকল্প খোঁজে। বোধ করি সেজন্যই হিন্দি বা ভারতীয় চ্যানেলগুলোর দুর্দান্ত বাজারে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ। মুম্বাই'র হিন্দি আর কোলকাতার বাংলা সিরিয়ালের দর্শক এদেশের ঘরে ঘরে। এসব চ্যানেলেরও সমালোচনা আছে। তবু তাদের দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যথাসময়ে অনুষ্ঠান শুরু করা এবং বিজ্ঞাপন প্রচারের মাত্রা এখনো সহনীয়।

জর্জ নরম্যান ডগলাস বলেন, "You can tell the ideals of a nation by its advertisements." একটি দেশের আদর্শগুলো ফুটে ওঠে তার বিজ্ঞাপনে। আমাদের গণমাধ্যমে এই যে মাত্রাতিরিক্ত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তা কি দেশের আদর্শের কথা বলে? বিজ্ঞাপনের ভাষা, আধেয় এবং উপস্থাপনা কি আদর্শস্থানীয়? "আবার জিগায়", "খাইলেই দিল খোশ", "একা একা খেতে চাও, দরজা বন্ধ করে খাও" বিকৃত ভাষা আর স্বার্থপরতা চর্চার এমন আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। সদ্যোজাত শিশু থেকে নবতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকেই বিজ্ঞাপনের টার্গেট অডিয়েন্স। ১৬ কোটি ভোক্তার এই বাংলাদেশ তাই মুনাফালোভী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর উর্বর বাজারে পরিণত হয়েছে। মাথায় শ্যাম্পু দিলেই আজ আর চলে না। শ্যাম্পুর পরে চাই কন্ডিশনার। ঠোঁটে লিপস্টিক দিবেন। কিন্তু সেটির সীমা-পরিসীমা নির্ধারণের জন্য কিনতে হবে লিপ-লাইনার। সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন, সৌন্দর্যই (গায়ের রং ফর্সা অর্থে) জীবন। যে সুন্দর নয়, তার বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

গণমাধ্যমকে বলা হয় প্রহরী (Watchdog), জাতিকে পাহারা দেওয়া। জাতির স্বার্থকে, জাতির বিবেককে, সর্বোপরি জাতির আদর্শকে। সেই গণমাধ্যমই যখন মুনাফার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, তখন জাতিকে পথ দেখানোর আর কে থাকে?

জাতিকে পথ দেখানোর জন্য অবশ্য নিজেদেরই একটি পথ থাকা দরকার। বিশেষ করে বাংলাদেশে দ্রুতবর্ধনশীল (Mushrooming) মিডিয়া খাত বেসরকারি টেলিভিশনের জন্য। রাজনীতি আর ব্যবসা উদ্ধারের অন্যতম 'কার্যকরী' হাতিয়ার হয়ে ওঠা এই খাত চলছে কোনো রকমের নিয়মনীতি ছাড়াই। বাংলাদেশে বেসরকারি টেলিভিশনের সংখ্যা এক ডজন ছাড়িয়ে গেছে। আরো বেশ কয়েকটি পরীক্ষামূলক সম্প্রচারে রয়েছে। শিগগিরই তারা আনুষ্ঠানিক সম্প্রচারে আসবে। বেসরকারি টিভি চ্যানেল এখন একটি শক্তিশালী মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার একটি নীতিমালা থাকা জরুরি। চ্যানেলগুলোর মালিকপক্ষ অবশ্য সরকারি কোনো নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহী না। কারণ তাতে একতরফা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা করার ক্ষেত্র নষ্ট হতে পারে। তবু এতবড় এবং এতবিস্তৃত একটি সেক্টর নীতিমালা ছাড়া চলতে পারে না। অবশেষে সেই বিলম্বিত উপলব্ধি থেকেই সরকার একটি বেসরকারি সম্প্রচার নীতিমালার খসড়া তৈরি করেছে এবং সর্বশেষ খবর পর্যন্ত সেটি তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু খসড়ার যতটুকু জানা গেছে তা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই বলেছেন, এই নীতিমালা হলে সেটি হবে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার।

বেসরকারি সম্প্রচার নীতিমালায় প্রস্তাব করা হয়েছে, কোনো আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার অসঙ্গতিপূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বা উপাত্ত দেয়া যাবে না। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে টেলিভিশন বা রেডিও বা অনুষ্ঠান পরিচালক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। আমরা ধরে নিতে পারি, আলোচনামূলক অনুষ্ঠান বলতে মূলত টক-শোগুলোকে বোঝানো হয়েছে। টক-শো হচ্ছে এক ধরনের মুক্ত আলোচনা। এখানে সংশিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ তাদের মতামত দেন। থাকে দর্শকদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ। সংবাদপত্রে একটি বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নিয়ে যে সংবাদ প্রতিবেদন লেখা হয়, টক-শো হচ্ছে তার ডিজিটাল রূপ। অনেকেই টক-শোর সমালোচনা করেন। অভিযোগ করেন, জাতিকে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে এবং একজন ব্যক্তি সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞ-মতামত দিচ্ছেন। আবার কোন চ্যানেলে কে অতিথি হয়ে আসবেন সেটি নির্ধারণেও থাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাত। তবুও স্বীকার করতেই হবে, এখনো পর্যন্ত টক-শো একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এগুলোর অধিকাংশই সরাসরি সম্প্রচারিত হয় বলে দর্শকদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে টেলিফোনে এলাকায় 'প্রায় অমাবশ্যার চাঁদ' হয়ে ওঠা নেতানেত্রীদের সঙ্গেও কথা বলা যায়। সংকটাপন্ন মানের অনুষ্ঠান এবং লাগামহীন বিজ্ঞাপনের 'হোম বক্স' টিভি চ্যানেলগুলো যা একটু দর্শক পায় তা তো এই টক-শো থেকেই! সেই টক-শো কে নিয়ন্ত্রণের

একটি 'রেসিপি' খসড়া নীতিমালায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সব সরকারই বোধ হয় এই টক-শো ভয়ে ভীত থাকে। বাংলাভিশনের একটি জনপ্রিয় টক-শো বন্ধ হয়ে গেছে। দিগন্ত'র একটি টক-শোকে বন্ধ করা হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এগুলো ভালো কোনো চর্চা নয়। মানুষ এখন অনেক সচেতন। মুক্ত চিন্তা আর মুক্ত আলোচনার এ যুগে কাউকেই অন্ধকারে রাখা যায় না। কোনো ধরনের নীতিমালা না থাকা অবস্থাতেই যেখানে টক-শো বন্ধ হয়ে যায়, সেখানে "কোনো প্রকার অসঙ্গতিপূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বা উপাত্ত দেয়া যাবে না" এর ব্যবহার হতে পারে ভয়াবহ। 'অসঙ্গতিপূর্ণ', 'বিভ্রান্তিমূলক' এই শব্দগুলো বহুত্ববোধক এবং তাই এর ব্যবহারও (অপব্যবহার) হতে পারে ইচ্ছেমূলক। আমরা নিশ্চয়ই অবগত আছি, ক্ষমতা শুধু 'সত্য'ই নয়; নির্মাণ করে শব্দ এবং তার অর্থও। কোন তথ্যটি অসঙ্গতিপূর্ণ, যেটি আপনার পক্ষে নয়? বলা হয়েছে, "রাজনীতি বিষয়ে নেতিবাচক কিছু প্রচার করা যাবে না"। কী অদ্ভুত নীতিমালা! তার মানে সরকার যা করবে তা-ই মেনে নিতে হবে। সরকার কোনো ভুল করলে তা বলা যাবে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে, শেয়ারবাজারে ধস নামলে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে, দুর্নীতি হতে থাকলে এসবের বিরুদ্ধে কিছুই বলা যাবে না। তাহলে কি প্রত্যেকটি টিভি চ্যানেল হতে যাচ্ছে এক একটি বিটিভি?

বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় এমন কোনো বিষয়ে প্রচারণা চালানো যাবে না বলে নীতিমালায় প্রস্তাব করা হয়। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথাই সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধিকার বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের চুলছেড়া বিশ্লেষণ করা যাবে না। কেউ প্রতিনিয়ত আমাদের ওপর খবরদারি করবে, আর গণমাধ্যম সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক করবে না, জানাবে না তা হতে পারে না। ভারতীয় পণ্যেরই শুধু নয়; তাদের চ্যানেলেরও উর্বর বাজারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। অথচ বাংলাদেশের চ্যানেল এখনো পর্যন্ত ভারতে নিষিদ্ধ। ভারতে বাংলাদেশের চ্যানেল নিষিদ্ধের পেছনে এক ধরনের বাণিজ্য কাজ করছে। বাংলাদেশের কিছু পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ভারতে। কিন্তু ভারত চায় না সেই পণ্যগুলোর বিজ্ঞাপন তাদের দেশে প্রচারিত হোক। এ কারণেই সেখানে আমাদের চ্যানেল নিষিদ্ধ। এখন কোনো চ্যানেল যদি এ বিষয়ে কোনো প্রতিবেদন প্রচার করে তাহলে তা 'বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট'র দায়ে দুষ্ট হবে?

যে খসড়া নীতিমালা করা হয়েছে, এসব কারণে, সেটি যথেষ্ট পরিণত হয়নি বলেই মনে হয়। এতে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়েই নীতিমালাটি করা হয়েছে। এটি প্রণয়নে গণমাধ্যম-বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ ছিল অপরিহার্য। অথচ এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অনেকগুলো মৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বিজ্ঞাপন প্রচার নিয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা দরকার। বিজ্ঞাপনের আধেয় নিয়েই শুধু নয়; তার সংখ্যা নিয়েও। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ব্যবহারে আরো বেশি সচেতন হওয়ার নীতিমালা থাকতে হবে। শিক্ষা এবং উন্নয়ন বিষয়ে পর্যাপ্ত অনুষ্ঠান প্রচারের ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। এসব বিষয় উপেক্ষা করে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করলে তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। সম্প্রচার মাধ্যমকে মানোত্তীর্ণ করার জন্য একটি ব্রডকাস্ট ইনস্টিটিউট গঠনের বিকল্প নেই। সেই সঙ্গে সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য একটি ব্রডকাস্ট কাউন্সিল। খসড়া নীতিমালাটি তথ্য মন্ত্রণায়ল বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপন করা হয়েছে। আশা করবো স্থায়ী কমিটি নীতিমালাটি ভালোভাবে খতিয়ে দেখবেন। সর্বোপরি বেসরকারি সম্প্রচার নীতিমালা চূড়ান্ত করার আগে নানারকমের সভা-সেমিনার, উন্মুক্ত আলোচনা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ-এসবও অপরিহার্য।

ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ, সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। রফিকুজজামান, প্রভাষক, যোগাযোগ ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা), ঢাকা।

ও বন্ধু আমার

ফকির আলমগীর

আমি আমার জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর শোকগাথা লিখছি, একথা ভাবাই যায় না। গত বছর ঈদের দিনে আমার চার বছরের নাতি ফারদিনকে নিয়ে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে বাসায় ফেরার পথে কমলাপুর জসিম উদদীন রোডে আজম খানের বাসায় তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। মাত্র কয়েক দিন আগে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে আজম খান তাঁর মুখগহ্বরে ক্যান্সারের প্রথম পর্যায়ের চিকিৎসা শেষে মাত্র দেশে ফিরেছিলেন। দুই বন্ধু অনেক গল্প করলাম, ছবি তুললাম। আজম আমার নাতিকে অনেক আদর করল, কোলে তুলে নিয়ে ছবি তুলল। তার চিরচেনা, স্মৃতিঘেরা ছাদে দুই বন্ধু অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে সিঙ্গাপুরের চিকিৎসার অনেক কষ্টের, অনেক অভিজ্ঞতার গল্প শুনলাম। এরপরও অনেকবার ছুটে গেছি বন্ধুর কাছে, খোঁজখবর নিয়েছি। স্বপ্ন দেখেছি সবার সহযোগিতায় আর ভালোবাসায় হয়তো বন্ধু আমার মঞ্চে গাইবে, হাঁটবে, ক্রিকেট খেলবে, কলোনির মাঠে কিশোর-যুবকদের নিয়ে খেলায় মেতে উঠবে, ছোট্ট নাতনিকে নিয়ে ডাক্তার ডাক্তার খেলবে, সুইমিংপুলে গিয়ে সাঁতার শেখাবে, নতুন অ্যালবাম তৈরির জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে ছোটাছুটি করবে। কিন্তু তা আর হলোনা। আজম খান সবার প্রত্যাশা আর স্বপ্নকে ভেঙে দিয়ে ৫ জুন সকাল ১০টা ২০ মিনিটে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে লেখক ও আজম খান

আমার আরেক বন্ধু ফিরোজ সাঁই আর পিলু মমতাজের মতো তিনিও অচিন দেশের বাসিন্দা হলেন। যে শিল্পী গেয়েছিলেন,' কত আশা ছিল যে তার জীবনে, সব স্মৃতি রেখে গেলো মরণে, মা তার পাশে চেয়ে বসে আছে, রেললাইনের ঐ বস্তিতে জন্মেছিল একটি ছেলে, মা তার কাঁদে, ছেলেটি মরে গেছে।' আজম খানের মৃত্যুতে কেঁদেছে বাংলাদেশের সকল মা, কেঁদেছে আকাশ, বাতাস, নদী, ফসলের মাঠ। আজম খানের অবিস্মরণীয় বিদায়ে কেবল আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরাগী নয়, কেঁদেছে কমলাপুর, মতিঝিল, কেঁদেছে শহীদ মিনার, কেঁদেছে বাংলাদেশের হৃদয়। এ যে কেবল একজন শিল্পী, একজন পপগুরু কিংবা একজন মুক্তিযোদ্ধার বিদায় নয়, মৃত্যু নয় একজন সেলিব্রেটির। এ হচ্ছে একজন নির্মোহ, নির্লোভ সাদা মনের মানুষের বিদায়। যিনি বসবাস করতেন মানুষের অন্তরে, হাঁটতেন সবার হৃদয়ের কাছে। সহজ সরল জীবন যাপন করতেন, লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে নীরবে, নিভৃতে, সবার অলক্ষে থাকতেন আপন ভুবনে। আজম খান থাকতেন পল্লীকবি জসিম উদদীন সড়কে একজন পল্লীগ্রামের মেঠো মানুষের মতই। ভালোবাসতেন পাখপাখালি, গাছপালা, জ্যেৎস্না, চাঁদ-আকাশ, খোলা মাঠ, নদী আর উদাস দুপুর, আউল বাউল ভালোবাসা ছিল তাঁর অন্তর জুড়ে।

আজম খানের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা ইমা খান যথার্থই বলেছেন, 'দেশ, দেশের মানুষ আর মাতৃহারা তিন সন্তানের জন্য জীবনের শতভাগ সময় নির্মোহভাবে ব্যয় করেছেন আজম খান। কিছুদিন আগেও যিনি খেলার মাঠে ব্যাটবল হাতে দুরন্ত , সুইমিং পুলে দুর্বার আর মাইক্রোফোন হাতে টিভি কিংবা মঞ্চে দুর্জয়, সেই মানুষটি আজ সব কিছুর ওপারে। এক্ষেত্রে অনেক শিল্পীই তদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমি এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যান্ড তারকা জেমস-এর মন্তব্য তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন, 'সূর্যহীন সময় পার করব আমরা। আজম খানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি অধ্যায়ের অবসান। এখন থেকে আমরা সূর্যহীন সময় পার করব। এই অন্ধকারে তাঁর রেখে যাওয়া গান আমাদের আলো যোগাবো । সেই আলো বুকে ধারণ করে আমরা হাঁটব অনন্তকাল, পাড়ি দেব জ্যোৎস্নারাত। সকাল হবে না জানি, সূর্য উঠবে না জানি, আজম ভাই ফিরবেন না জানি তবু তাঁর কণ্ঠ আর গান নিয়ে আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকবে।' আমারও প্রত্যাশা তাই। এইতো সেদিন যুদ্ধফেরত কয়েক বন্ধু মিলে বাংলাদেশের প্রথাসিদ্ধ গানের বন্ধ্যা ভূমিতে পাশ্চাত্যের সুরের সঙ্গে দেশজ সুরের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই ভূখণ্ডে যে আধুনিক পপ ধারার সূচনা করেছিলাম, যার ধারাবাহিকতায় আজকের জনপ্রিয় ব্যান্ড সঙ্গীত। কিন্তু আজম খানের সাথে আমার বন্ধুত্ব স্বাধীনতার পূর্বে। পূর্ব পাকিস্তানের শেষ সময়গুলোতে যখন ক্রমাগত গণআন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের পরাজয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, ঠিক সেই সময়গুলো থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পূর্ণ বিজয় অর্জন হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে, মিছিলে মিটিং-এ, জনসভায় একত্রে অংশ নিয়েছি। ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সক্রিয় সদস্য হিসেবে, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানির অনুসারী হিসেবে লালটুপি

মাথায় দিয়ে কৃষক শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। কামাল লোহানী, আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুৎফর রহমান, নিজামুল হক, আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখদের নেতৃত্বে ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর মাধ্যমে আমরা দুই বন্ধু সাক্ষাত বলয়ে প্রবেশ করি। আবদুল লতিফ, সুখেন্দু চক্রবর্তী, মনিরুল আলম মনু, সাধন ঘোষের নেতৃত্বে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেছি, পল্টন থেকে লালদিঘি ময়দান, টঙ্গী থেকে সন্তোষ, খালিসপুর থেকে আদমজি বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল, মওলানা ভাসানির জনসভায় কিংবা ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন, অভিষেক, নবীনবরণে, আন্দোলন, সংগ্রাম আর গণসঙ্গীতের মাধ্যমেই আমরা দুজনে দুজনের কাছাকাছি আসি। তারপর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একসঙ্গে ছিলাম। আমার জন্ম ১৯৫০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আজমের ২৮ ফেব্রুয়ারি। একই বয়সের দুই বন্ধু সুখে-দুঃখে একত্রে থেকেছি, একত্রে স্বপ্ন দেখেছি, লড়েছি একত্রে। দুজনেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি এক সাথে। গল্পে আড্ডায় কেটেছে কতটি বছর, তা কি সহজে ভোলা যায়? এইতো সেদিন ২৮ জুলাই হারালাম আমাদের দুজনেরই গণসঙ্গীতের গুরু মনু ভাইকে। আসাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই জনপদে গণসঙ্গীতের যে বিকাশ ঘটে তার নায়ক ছিলেন মনু ভাই। আমি, আজম ছিলাম তাঁর সহযোদ্ধা।

যাক সে প্রসঙ্গ, আজম খান ছিলেন একটা জীবন্ত ইতিহাস। তিনি সহজ সরল জীবনের অধিকারী, অন্যদিকে অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মানুষের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে যে ফারাক ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তাঁর গানের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের অনিবার্যতায় একজন আজম খানের জন্ম হয়েছিল। মানুষের সংকটময় মুহূর্তে আজম খানের সৃষ্টি। তিনি গানের মধ্যে দিয়ে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির কথা বলেছেন, সমস্যা, সংকট আর ভালোবাসার কথা বলেছেন। হতাশা থেকে বের হতে আজম যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তা সেই সময়ের মানুষের কাছে মনে হয়েছিল পরিবর্তনের সুবাতাস। সঙ্গীতে এই নতুন ধারার প্রবর্তন কি সহজে ভোলা যায়? তার জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে দিয়েই তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন রেল লাইনের ওই বস্তিতে/ আলাল ও দুলাল/ হাইকোর্টের মাজারে কত ফকির ঘোরে/ এত সুন্দর দুনিয়ার কিছুই রবে না/ অনামিকা অভিমানি আসি আসি/পাপড়ি সেই মেয়ে চোখে দেখে না/ সারা রাত জেগে জেগে/ তুমি হারিয়ে গেছ/ জ্বালা জ্বালা/ ওরে সালেকা ওরে মালেকা/ আমি বাংলাদেশের আজম খান বাংলাতে গাই পপ গান/ জীবনে কিছু পাব নারে ইত্যাদি গান। এ সব গানগুলোতে খুব সহজ সরলভাবে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিমান ভালোবাসার কথা। এ সব গানের কথা, সুর, গায়কী কোথাও কোনো চালকি বা ফাঁকিবাজি ছিল না। গান তার কাছে শুধু আনন্দ-বিনোদনের বিষয় ছিল না, বরং এসব গান ছিল একজন যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধার অন্যরকম যুদ্ধের হাতিয়ার। তিনি যেন স্টেনগান রেখে হাতে গিটার তুলে নিলেন অন্য রকম যুদ্ধের জন্য। সময়ের প্রয়োজনেই ভিন্ন সুর, ভিন্ন কথা, ভিন্ন গায়কীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। অর্থাৎ ওই সময়ে তারুণ্যের অন্তর্গত চেতনা, বক্তব্য, গতি ও অদৃশ্য ক্ষিপ্রতাকে প্রকাশের জন্যই তাকে ভিন্ন ধারার প্রকাশভঙ্গিতে যেতে হয়েছে। এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে সমালোচনাও কম হয়নি। কিন্তু তিনি কোনো অপপ্রচার-সমালোচনায় কান দেননি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে হটিয়ে রাগি শব্দ আর তেজি সুরের সজাগ উচ্চারণে আর স্বভাবজাত প্রবৃত্তিতে শুরু করলেন গানের এক ব্যতিক্রমী পথচলা। সঙ্গীতের যে তেজ নিজের ভেতরে অনুভব করতেন তাই প্রকাশ করতেন দর্শক-শ্রোতাদের সামনে। নিজের সহজ সরল এবং সাবলীল উপস্থাপনার জন্যই আজম খান হয়ে উঠলেন আজকের পপসম্রাট। পপ গানের প্রেক্ষাপটে আমি, ফেরদৌস, পিলু, ফিরোজ সাঁই ও নাজমা জামান প্রথম থেকে জড়িত থাকলেও, আজম খানের উচ্চারণ ব্যান্ডের সতীর্থসহ বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের মধ্যে ইশতিয়াক, ল্যারি, মুসা, নীলু, ইদু, রেজা কিবরিয়া, বাবুল, বজলুল করিম, কচি, শফিকুল আলম, নয়ন মুন্সি, রকেট, ফোয়াদ নাসের বাবু, কাজী হাবলু, পিয়ারু খান সহ অনেকের নাম স্মরণীয়। যা হোক আজম খান একজন শিল্পী বা একজন নাম মাত্র নয়, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে, বাংলা গানের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আজম খান একটি ঘটনা, একটি অধ্যায়। যা কোনো ভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। আজ তিনি নেই, তার কর্ম, তার চেতনা থাকবে নতুনত্বের পথে আলোর মশাল হয়ে। মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পী, সর্বোপরি একজন মানবিক মানুষ, বন্ধু আজম খানের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। গত ঈদেও ছিল আজম খান-এবার ঈদে তার ভাইবোন, সন্তানদের কাছে তা কেবল স্মৃতি। উঠবে শাওয়ালের চাঁদ, কেবল আজম খান ফিরে আসবে না। তার অপেক্ষায় বসে থাকবে ইমা খান, হৃদয় খান, অয়না খান, কেবল তার বাবা ফিরে আসবে না। তাকে সর্বক্ষণ দেখভাল-করা সালমার মা ঈদের সেমাই রান্না করে অপেক্ষায় বসে থাকবে, কেবল আজম খান ফিরে আসবে না। এবার ঈদে ইমার মা-ও হয়তো দুফোঁটা চোখের জল ফেলবে। আর তাঁর গানের আলাল, দুলাল, ফুলবানু, অনামিকা, পাপড়ি তার শূন্যতায় কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। খাঁ খাঁ করবে তার স্মৃতিঘেরা টাওয়ার হোটেল, চিটাগাং হোটেল, মধুমিতা কিংবা জসিম উদদীন সড়ক।

শিল্পী ফকির আলমগীর, সভাপতি, ঋষিজ

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম

এম খায়রুল কবীর

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রথমে ইউরোপে বিকাশ লাভ করলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ব্যবস্থা হিসেবে সমগ্র বিশ্বে এ ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে। সামগ্রিক বিবেচনায় গণতন্ত্রকে একটি সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে; যা একটি সমাজে দীর্ঘ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং চর্চার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে থাকে এবং যা সেই সমাজের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র পুঁজিবাদী সমাজের মতাদর্শ হলেও তা পুঁজিবাদকে ছাড়িয়ে বিকশিত হতে পারে যথার্থ চর্চার মাধ্যমে। বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রবিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক গণতন্ত্রের জয়গান করেছেন। বলা হয় যে, সাফল্যমণ্ডিত গণতান্ত্রিক শাসনই সুশাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে। আমরা জানি, গণতন্ত্র জনগণের কাছে সরকারকে দায়িত্বশীল রাখে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থ যথেষ্টভাবে সুরক্ষিত হতে পারে। গণতন্ত্রেই সামগ্রিক সমৃদ্ধি বেশি পরিমাণে অর্জন সম্ভব। সর্বোপরি গণতন্ত্রের বড় গুণই গণতান্ত্রিক চর্চার ফলে জনগণের মাঝে রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। গণতন্ত্র মানুষের মেধা ও জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়।

গণতান্ত্রিক মানুষ তৈরি করার জন্য প্রয়োজন অনুকূল সামাজিক পরিবেশ। কেননা, আমরা জানি, মানুষ গড়ে ওঠে সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ায়। গণতন্ত্র যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলে, তেমনি এটি সামাজিক ব্যবস্থা ও আইনকেও প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এর সবই নির্ভর করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠার ওপর।

অন্যদিকে মানবাধিকার হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ যা মানবজীবন ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা প্রদান করে থাকে। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হতেই অধিকারের উদ্ভব হয়। কেননা, মানুষ সামাজিক জীব; সমাজই তার বাসস্থান ও কর্মস্থল। মূলত গোটা বিশ্বেই স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি হচ্ছে সকল মানুষের সহজাত মর্যাদা ও সকল অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলোর স্বীকৃতি। কিন্তু যদি মানবিক অধিকারগুলোর প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শিত হয় তা হলে তা হবে গোটা মানবজাতির বিবেকের জন্য অপমানজনক। অতএব, রাষ্ট্রকেই মানবাধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সরকার তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে, এটাই প্রত্যাশিত।

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।" সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে। মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্ধারিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

সংবিধানের তৃতীয় ভাগের প্রায় পুরো অংশ জুড়েই মৌলিক অধিকারের বিষয়টি বিধৃত হয়েছে। আইনের দৃষ্টিতে সমতা; ধর্মের কারণে বৈষম্য নয়; সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা; আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার; জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ; চলাফেরার স্বাধীনতা; সমাবেশের স্বাধীনতা; সংবিধানের স্বাধীনতা; চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা; বাক্ স্বাধীনতা; পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা; ধর্মীয় স্বাধীনতা; ইত্যাদি বিষয়গুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানবকুলের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে যথার্থভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার সংবিধানে মানবাধিকার নিশ্চিত করেছে। এ কথা সত্য, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার একে অপরের সম্পূরক ও পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি অচল।

আমরা সকলেই জানি, ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা গৃহীত হয়। এই ঐতিহাসিক দলিল গ্রহণের মাধ্যমে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এ কথা স্বীকার্য, সকল মানুষই অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অধিকারগুলোর সমান অধিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এ সকল অধিকার সম্পর্কে কতজন মানুষ সচেতন? কতজন জানেন, এ সব অধিকারই তার সম্পদ?

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে মোট ৩০টি ধারা আছে। প্রথম ধারাটিই হচ্ছে, "সকল মানুষই স্বাধীন অবস্থায় (শৃংখলহীন) এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা সকলেই বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। অতএব, তাদের একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করা উচিত।" এ ঘোষণাপত্রে জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা

অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলকেই সকল অধিকারের সমান অংশীদার করা হয়েছে। যেমনটি করা হয়েছে আমাদের সংবিধানে ২৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৪টি অধিকারবলে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় ১৯৪৮ সালে এবং বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত ও বলবৎ হয় ১৯৭২ সালে। ফলে আমরা লক্ষ করি যে, বাংলাদেশের সংবিধানের বড় একটি অংশই জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রতি আনুগত্যশীল। এটা গণতান্ত্রিক একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীরই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের সংবিধান সে কারণে আন্তর্জাতিক মহলেও মূল্যবান দলিল হিসেবে স্বীকৃত।

আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।" একই অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃংখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।" এর অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'সংবাদক্ষেত্র' স্বাধীন মতবাদের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে দ্বিধাহীন চিত্তে কেবলমাত্র 'সাপেক্ষে' শব্দটির প্রতি লক্ষ্য রেখে।

আমরা জানি গণযোগাযোগের প্রধান মাধ্যমগুলো আধুনিক সাংবাদিকতার মাধ্যম। এগুলো প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ সংবাদপত্র, সাময়িকী, বই, জার্নাল, প্রচারপত্র, লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার, স্যুভেনির প্রভৃতি এবং ইলেক্ট্রানিক মিডিয়ার আওতায় শব্দ মাধ্যম। এর অন্তর্ভুক্ত রেডিও, টেপরেকর্ডার, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি ও গতিমাধ্যম এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ভিডিও প্রভৃতি। তাছাড়া অন-লাইন মিডিয়াও এখন বেশ জনপ্রিয়।

গণমাধ্যমের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তথ্য সরবরাহ করা, শিক্ষিত করা, প্রভাবিত করা, বিনোদন দেয়া, ব্যাখ্যা করা, পথ নির্দেশ দেয়া, এবং প্রহরীর ভূমিকা পালন করা। এই ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার যুগেও তাই সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমই সমান তালে এই ভূমিকা পালন করে চলেছে। বলা চলে এই গণমাধ্যমগুলো একে অপরের সম্পূরক ও পরিপূরক। আমাদের দেশে গণমাধ্যমের প্রচার ও প্রসারের দিকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গণমানুষকে অবহিত করতে, তথ্য সরবরাহ করতে, সচেতন করতে, গণমাধ্যমগুলো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টমাস জেফারসন একবার প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, "আমাকে যদি সংবাদপত্রবিহীন সরকার বা সরকারবিহীন সংবাদপত্র এ দু'টোর একটিকে বেছে নিতে বলা হয় আমি শেষেরটা বেছে নিতে মুহূর্তের জন্যও ভাববো না।" তাঁর এ অসাধারণ বিবৃতি থেকে বোঝা যায় অবাধ তথ্য গণতন্ত্রের জন্য, মানবাধিকারের জন্য কতটা মূল্যবান। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো রাষ্ট্রের কোনো সরকারের অবয়ব শুধুমাত্র সংসদীয়, বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক অঙ্গের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং একটি আলাদা এবং খুব জরুরি আরো একটি তথা চতুর্থ অঙ্গ রয়েছে যাকে সংবাদক্ষেত্র বলা হয়। ফলে সংবাদক্ষেত্র ছাড়া গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা এক রকম অসম্ভব।

আমাদের সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারবলে সকল গণমাধ্যমই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মনে রাখতে হবে গণমাধ্যমই একাধারে স্বাধীনতার প্রবর্তক ও একই সঙ্গে সেই স্বাধীনতা প্রয়োগে দায়িত্বশীলও। আত্মমর্যাদাশীল গণমাধ্যম সমাজের প্রতি এই দায়িত্ব পালনে নিরন্তর প্রয়াসী।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাই গণমাধ্যমকে হতে হবে অবশ্যই স্বাবলম্বী; হতে হবে অবশ্যই নিরপেক্ষ; হতে হবে তথ্য পরিবেশনায় অবশ্যই যথার্থ; হতে হবে অবশ্যই সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ; হতে হবে অবশ্যই দায়িত্বশীল, এবং হতে হবে অবশ্যই পরিচ্ছন্ন। আশার কথা, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের কিছু প্রগতিশীল ও সংবাদ পরিবেশনে নির্ভীক গণমাধ্যম গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক লেখালেখি ও প্রচারের মাধ্যমে পাঠক ও দর্শকসমাজকে অবহিত করছে, সচেতন করছে এবং কার্যত তা প্রয়োগে উৎসাহিত করছে। যদিও আমরা আমাদের সংবিধান ও মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সংশ্লিষ্ট অনেক অনুচ্ছেদ বা ধারার স্পষ্ট লঙ্ঘন দেখতে পাচ্ছি তথাপি এটা ঠিক গণমাধ্যমের মাধ্যমে এ দেশের জনগোষ্ঠী এই নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হতে পারছেন। এই নেতিবাচক দিকগুলোই ইতিবাচক প্রয়োগে পথ ও পাথেয় হতে পারে যদি সে পথের ইঙ্গিত গণমাধ্যমগুলো সঠিকভাবে দিতে পারে। ইতিবাচক সংবাদগুলোও প্রকাশ ও প্রচার করতে পারে নিয়মিত, ঘন ঘন।

সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য পথ দেখানোর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। এখানে সন্দেহের ছাকনি নেই। বরং গণমাধ্যমকে আরো বড় ভূমিকা পালন করার জন্য উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রত্যাশা সময়ের চাহিদা।

এম খায়রুল কবীর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর সাবেক মহাপরিচালক। এ প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি এজাজুল হক চৌধুরীর 'মানবিক উন্নয়ন' এফ, ফ্রেজার বন্ডের 'সাংবাদিকতা পরিচিতি', জাতিসংঘের 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র' এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'সংবিধান' এর সহায়তা নিয়েছেন।

নীরবে, নিঃশব্দে চলে গেলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা সাংবাদিক আখতারুজ্জামান

মনোরঞ্জন মণ্ডল (মনোজ)

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত আমাদের, অ্যালামনাস সাংবাদিক আখতারুজ্জামান ৬৫ বছর বয়সে গত ২৩ আগস্ট চিরবিদায় নিয়েছেন। তিনি ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রি নিয়েছিলেন। এ যোগসূত্রের জন্যই তিনি আমাদের আপনজন ও সতীর্থ। একজন সৃষ্টিশীল গুণী মানুষের জন্য এ চলে যাওয়াকে অকাল প্রয়াণই বলা যায়। তিনি হাতেগোনা বিরল প্রতিভার অধিকারী চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার পথিকৃদের অন্যতম ছিলেন। আর তাঁর সৃষ্টিশীল প্রয়াসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রি নেওয়ার আগেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় সিনে *সাপ্তাহিক চিত্রাকাশে* সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় দু'বছর *চিত্রাকাশেই* কাজ করেছেন দক্ষতার সাথে। এরপর যোগ দিয়েছেন *দি পিপল, দি নেশন* ও *সামজে*। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত কাজ করেছেন জনপ্রিয় সিনে *সাপ্তাহিক চিত্রালীতে*। ১৯৮৫ সালে যোগ দেন *বাংলার বাণী* ভবন থেকে প্রাকাশিত *সাপ্তাহিক সিনেমায়*। নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে এ পত্রিকায় তিনি ছিলেন মধ্যমনি। এ পত্রিকা তিনি নয় বছর কাজ করেন।

এরপর দৈনিক *বাংলার বাণী*, *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ* এবং সর্বশেষ ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত *দৈনিক যুগান্তর*-এর শিফট-ইন-চার্জ হিসেবে কাজ করেছেন। তবে চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে তার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি।

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস হলেও তিনি জন্মেছিলেন ১৯৪৭ সালের ১১ জানুয়ারি পাশের গ্রাম মির্জানগরে। খুব অল্প বয়সেই তিনি গ্রাম ছেড়ে পিতামাতার হাত ধরে ঢাকায় শান্তিবাগে চলে আসেন।

পঞ্চাশ দশকে ক্রমশ নগর হয়ে ওঠা এই ঢাকায় তিনি বেড়ে ওঠেছেন। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের জনাকীর্ণ রাজধানী ঢাকা তাঁর জীবন ও স্বপ্নকে প্রভাবিত করেছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু তিনি গ্রামীণ জীবনযাত্রা, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অনুভূতিগুলো ভুলে যাননি। তাঁর চলচ্চিত্র ও নাটকে নিঁখুতভাবে আমাদের গ্রামীণ জীবনকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন আন্তরিকতার সাথে।

তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। এরপর ঢাকা কলেজ থেকে মাধ্যমিক, জগন্নাথ কলেজ থেকে বি এ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতায় এম এ পাশ করেন।

তাঁর ভাই বদরুজ্জামান জানিয়েছেন, তিনি আর দশটা ছাত্রের মতো ছিলেন না। আবৃত্তি চর্চা, গল্প লেখা, বই পড়ার ঝোঁক ছিল প্রবল। ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টনে বেশ দক্ষ ছিলেন। কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে এসে ঝুঁকে পড়েন নাটক আর গানে। খুব ভালো গান গাইতেন। তাঁর গানের গলাটাও ছিল চমৎকার। আব্দুল জব্বার, মাহমুন্নবী প্রমুখ শিল্পীদের সাথে তরুণ শিল্পী হিসেবে মঞ্চে উঠতেন, গাইতেন, প্রশংসাও পেতেন। তখন থেকেই সঙ্গীত রচনাও করতেন। এত ভাল কণ্ঠ, এত ভাল গায়কী অথচ গানের চর্চা ছেড়ে ছিলেন হঠাৎ করেই।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার বাইরে তিনি ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিচালিত ছয়টি ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স ও কর্মশালায়ও অংশগ্রহণ করেছেন।

শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণে যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, ভেতরে ভেতরে তার প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন দীর্ঘদিন যাবৎ, তা প্রথম সফল হয় ১৯৮৩ সালে। ঐ বছর তিনি তাঁর সাংবাদিক বন্ধু রফিকুজ্জামানকে নিয়ে যৌথভাবে নির্মাণ করেন *ফেরারী বসন্ত*। ছবিটি শ্রেষ্ঠ পরিচালকসহ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) এর ছয়টি পুরস্কার পায়। এর পরের বছর যাত্রা শিল্প ও শিল্পীদের বঞ্চনা, সুখ-দুঃখ ও অসহায়ত্ব নিয়ে নির্মাণ করেন *প্রিন্সেস টিনা খান*। এ ছবিটিও শ্রেষ্ঠ পরিচালকসহ বাচসাস-এর আটটি পুরস্কার লাভ করে। স্বাভাবিক কারণেই বলা যায়, এ সব ছবি ব্যবসা সফল হয়নি।

তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো, সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে ১৯৯৬ সালে নির্মিত ছবি। বত্রিশটি চিত্র নাট্যের মধ্যে এটি প্রথম হওয়ায় এর নির্মাণের জন্য তাকে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। সেরা পরিচালক, সেরা কাহিনী ও সেরা চিত্র গ্রাহক বিভাগেও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায় ছবিটি। এছাড়া বাচসাসও দশটি বিভাগে এ চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করে।

দীর্ঘ দিন পর '*সূচনা রেখার দিকে*' শিরোনামে আরেকটি চিত্রনাট্য সেরা বিবেচিত হওয়ায় এর নির্মাণের জন্য তাঁকে আবারও সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। তিনি ছবিটির ৯০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁকে চিরবিদায় নিতে হলো। এ চলচ্চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ধর্মের কারণে দেশের বিভাজন, চিরচেনা বাসভূমি, বাড়িঘর, বন্ধু-বান্ধব, আপনজনরা পর হয়ে যাওয়া, জাতীয়তা বদলে যাওয়া, উদ্বাস্তু জীবনের চিরকালীন ট্র্যাজিক আইরনি। এইসব দুঃখ-বেদনা তাঁর হৃদয়কে পীড়িত ও ব্যথিত করেছে। '*সূচনা রেখার দিকে*'র চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন এই থিমের উপর ভিত্তি করে।

তিনি স্ট্যাম্পফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম এন্ড মিডিয়া বিষয়ে পড়াতেন। আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে রিসোর্স পার্সোন হিসেবে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতেন তাঁর সৃষ্টিশীল প্রয়াস ও স্বপ্ন দিয়ে। তিনি বেশ কয়েকটি টেলিফিল্মও নির্মাণ করেছেন। এগুলো বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: *নিঃস্বের কাছে ঋণী* (বিটিভি), *তোমার কাছে যাবো বলে* (বিটিভি), *আলোছায়া* (বিটিভি), *খেসারত* (চ্যানেল আই), *কক্ষচ্যুত* (এটিএন), *এলো সে অবেলায়* (এটিএন)।

তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলেন। ১৯৮৭ সালে নির্বাচিত হন বাচসাস-এর সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া তিনি জাতীয় প্রেসক্লাব ও চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির স্থায়ী সদস্যও ছিলেন।

তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সংসার জীবনে আত্মপ্রকাশে কৃপণ এই মানুষটি খুবই দায়িত্বশীল ছিলেন। নীরবে তিনি পুরো সংসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। দুই ভাই, এক বোনসহ পরিবারের সবাইকে ছায়া দিয়েছেন বটবৃক্ষের মতো। তাঁর একমাত্র পুত্র আশিক মাহমুদ পুলককেও তিনি যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন। সে সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রতিষ্ঠিত। নিঃসঙ্গ করে গেছেন স্ত্রী আসমা জামান ও একমাত্র নাতনি অঙ্কিতাকে সহ অনেক আপনজন ও গুণগ্রাহীকে।

প্রচারবিমুখ, আত্মমর্যাদাশীল এই মানুষটি সারা জীবন মিডিয়ায় কাজ করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি থেকে গিয়েছেন, বলতে গেলে, মিডিয়ার প্রায় অন্তরালে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপের কবিতার কয়েকটি পঙক্তি বারবার মনে পড়েছে,

"Thus let me live unseen, unknown;
Thus unlamented let me dye;
Steal from the world and not a stone
Tell where I lye."*

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনবোধের জন্য সতীর্থ ও সহকর্মীরাও তাঁকে তেমন করে স্মরণ করেনি। এ ধরনের উদাসীনতা মেনে নেওয়া যায় কী?

মনোরঞ্জন মণ্ডল (মনোজ), সাবেক প্রযুক্তি সম্পাদক ও বিভাগীয় প্রধান, প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

** আলেকজান্ডার পোপের ১৭০০ সালে রচিত ODE on Solitude কবিতার অংশবিশেষ।*

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ : জানা অজানা কথা

স্বপন কুমার দাস

দেশে তখন এরশাদের সামরিক শাসন। জিয়া জমানার পর দু'বছরের অধিক পার হয়ে গেছে। এরশাদের ক্ষমতা দখলের দিন (২৪ মার্চ ১৯৮২) থেকেই এদেশের ছাত্রসমাজ বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এরশাদের সামরিক শাসনের বিরোধিতা করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে ছাত্রআন্দোলন বেগবান হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সেদিন মজিদ খানের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে ছাত্ররা শিক্ষাভবন ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেয়। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজকের দোয়েল চত্বরের মোড় থেকে কার্জন হলের পাশ ঘেষে পূর্ব দিকে সকাল থেকেই অবস্থান নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমি তখন আইবিএতে এমবিএ কোর্সের শেষ পর্যায়ের ছাত্র। তাই পড়ালেখার চাপটা ছিল হালকা। রাজনীতিসচেতন এবং প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির একজন কর্মী হয়েও বেশ কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিতে সময় দিতে পারছিলাম না। ফলে সেদিন যেন মন থেকেই একটু তাড়া অনুভব করছিলাম মিছিলে যোগ দেবার জন্য। সহস্র প্রতিবাদী কণ্ঠের সাথে নিজের কণ্ঠকে মেলানোর জন্য। তাই মিছিলের সাথে এগিয়েছিলাম কার্জন হল পর্যন্ত। শিক্ষাভবনের সামনে তখন অসংখ্য পুলিশ বেরিকেড দিয়ে দাঁড়ানো। মিছিল বাধা পেল কার্জন হলের শেষ প্রান্তের চৌরাস্তায়। আজকের দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষাভবনের মোড় পর্যন্ত হাজারো কণ্ঠের শ্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিলে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। ঠিক সে সময়েই একটি জরুরি কাজের কথা মনে হওয়ায় মিছিল ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর ফেরার সময় শাহবাগে বাস থেকে নামার পর পাবলিক লাইব্রেরি কেন্টিনে এসে শুনলাম দিপালী সাহা, জয়নাল, জাফরসহ বেশকিছু ছাত্র শহীদ হয়েছে, আহত অসংখ্য।

চকিতেই টগবগিয়ে উঠল রক্ত। ইচ্ছে হল ওখানেই চিৎকার করে প্রতিবাদ করি। দ্রুত বেরিয়ে আসতেই দেখা হল সহপাঠী সালাম এবং ছাত্রনেতা এম.এম আকাশের সাথে। তিনজন একসাথে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। জানতে পারলাম শহীদ ছাত্রদের মরদেহ নিয়ে আসা হয়েছে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে। দ্রুততার সাথে হলে এসে ততোধিক দ্রুততার সাথে বেরিয়ে পড়লাম অপরাজেয় বাংলার উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে দেখা অনেক ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক নেতার সাথে। হয়তো বক্তৃতা শেষে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন বটতলায় শহীদের মরদেহ আর অসংখ্য প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রী। আকতারুজ্জামান ভাই বক্তৃতা দিয়ে নেমে গেলেন। একটু পরেই হঠাৎ ছুটোছুটি শুরু। কিছু বুঝে উঠবার আগেই দেখলাম ট্রাকভর্তি অসংখ্য পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে ফেলেছে। সঙ্গে রঙিন-গরমপানি ছিটানোর রায়ট কার। লাঠি-বন্দুক নিয়ে মরদেহের দিকে তেড়ে এলো পুলিশের দল প্রতিবাদ সভায় আগত সকল ছাত্রছাত্রী জনতার দিকে। পুলিশের লাঠি-পেটায় সকলে দিগ্বিদিক ছুটছে। কেউ বা মল এলাকার দিকে, কেউ বা হলের দিকে, আবার অনেকে কলাভবনের অভ্যন্তরে। আমিও ছুটে গেলাম যে বিভাগে আমার প্রথম পড়ার সুযোগ হয়েছিল, সেই সাংবাদিকতা বিভাগের দিকে। কিন্তু হতাশ হতে হল। কারণ বিভাগের সকল কক্ষই তখন তালাবদ্ধ। উদ্ধত পুলিশের হাঁকডাক, হুমকি আর অত্যাচারের ভয়ে উঠলাম দোতলায়। সেখানেও ছুটে এল পুলিশ। আরও দ্রুতবেগে ছুটলাম তিন তলায়। কিছুটা নিরিবিলি, কিন্তু না, সেখানেও চিৎকার আর বুটের শব্দ, বুঝলাম এখানেও পুলিশ। পালালাম বাথরুমের ভিতর। বেশিক্ষণ গেল না। দু'তিনজন পুলিশ লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলল দরজা। ধরা পড়ে গেলাম। দেখলাম আরও অনেককেই অত্যাচার করা হচ্ছে বারান্দায়। সবাইকে টেনে-হিঁচড়ে লাঠি-চার্জ করতে করতে দোতলা একতলা হয়ে টেনে নিয়ে এল প্রধান সড়কে। শতাধিক লাঠির আঘাত নিয়ে অজস্র লাঞ্ছিত ছাত্রের সাথে আমিও তখন স্তম্ভিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে এভাবে পুলিশ ঢুকছে বলে আমি শুনিনি। কেউ দেখেওনি। '৭১-এ পাক হানাদার বাহিনী ঢুকেছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু স্বাধীন দেশে একযুগ পরেও এ হেন ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে প্রথম বর্বরতার শুরু। মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠে এটি একটি অভূতপূর্ব এবং আকস্মিক ঘটনা।

১০/১২ টি ট্রাক সারি সারি দাঁড়ানো। ছাত্রদের লাঠিপেটা করে তুলছে পুলিশেরা। ট্রাকে বসে দেখলাম কারো মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। কারও বা চোখমুখ ফুলে গেছে। কেউ কেউ ব্যথায় কাতরাচ্ছে। আমরা যে ট্রাকটিতে ছিলাম সেটি ভিসি সাহেবের বাসার সামনে দাঁড় করানো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালের ভিতরে ছেলে-মেয়েদের অসংখ্য জুতা-সেন্ডেল-চটি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে মেয়েদের জুতা-সেন্ডেলই বেশি। দোকানিবিহীন আইসক্রিমের ভ্যান, বাদামওয়ালার খালি বাক্সের পাশে ছড়ানো ছিটানো বাদাম। আইসবক্স থেকে আইসক্রিম এনে এক ভদ্র পুলিশ এক ছাত্রের মাথার রক্ত বন্ধ করতে লাগাতে লাগল।

বয়সে যারা বড় ছিল তারা ছোটদের সান্তনা দিতে চেষ্টা করতে লাগল। একটু দূরে দেখলাম কিছু প্রতিবাদী ছাত্র লাইব্রেরির সামনে শ্লোগান দিচ্ছে। প্রস্তুতি নিচ্ছিল বাধা দিতে। ট্রাকে করে ছাত্রদের যেন নিয়ে যেতে না পারে। বন্দী ছাত্রদের ট্রাক লক্ষ্য করে প্রতিবাদী ছাত্ররা কয়েটি ইট নিক্ষেপ করে। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো এই ভেবে যে ইটগুলো খোলা ট্রাকের ছাত্রদের গায়ে আঘাত করতে পারে ।

১০/১২ ট্রাক ভর্তি অজস্র পুলিশ এগিয়ে চলে টিএসির মোড় হয়ে শাহবাগের দিকে। চিৎকার, শ্লোগান শোনা গেল ট্রাক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, লাইব্রেরি আর আবাসিক ভবনের দিক থেকে। একে একে সবগুলো ট্রাক গিয়ে ঢুকল শাহবাগে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ভিতরে।

জায়গাটা অনেক কাছের কিন্তু সবারই অচেনা। ভিতরে অনেক পুলিশ কর্মকর্তা, মিলিটারি। সামরিক লোকজনই হয়তো ওখানকার পুলিশদের তখনকার নিয়ন্ত্রক। প্রায় পাঁচ ছয়শ' ছাত্র গাদাগাদি করে বসানো হয়েছে মাটিতে। চারদিকে অস্ত্রধারী পুলিশের বেষ্টনী। মাঝে মাঝে লাথি, কিল ঘুষি দিয়ে পুলিশরা তামাসা করছিল সদ্যবন্দী ছাত্রদের সাথে। আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত, এর পর কী হবে? কোথায় নেবে। এই তুমি কিভাবে ধরা পড়লে? মিটিং এ বটতলায়? কলাভবনে? খুব পিটিয়েছে তোকে? আরে তুই না কখনো মিছিলে যাস না? এভাবেই একে অপরের সাথে মত বিনিময় করছিল আকস্মিক এ ঘটনাকে নিয়ে। চোখে-মুখে-মনে সবারই উৎকণ্ঠা। দুশ্চিন্তা-ছোটভাইটা হলে যেতে পেরেছে কিনা? নাকি এখানেই বন্দী ছাত্রদের মাঝেই আছে? কার্জন হল আর কলাভবন একাকার হয় মিছিলে, শ্লোগানে। আজ অত্যাচারী পুলিশের অতিথিশালায় আমরা সবাই একাকার।

একটু পরেই আমন্ত্রণ (হালকা নাস্তার নয় কিন্তু)। একজন একজন করে তুলে নেয়া লাঠি হাতে দাঁড়ানো ৭/৮ জন আর্মড ব্যাটেলিয়ন পুলিশের কাছে। একজন বাঁশি বাজাল, অমনি সবাই একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাঠির আঘাত চলল প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট। আবার বাঁশির শব্দ, বন্ধ আঘাত। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল ছাত্রটিকে অনতিদূরে। এভাবেই একজনের পর আর একজন। ২/৩টি উন্মুক্ত টর্চার প্লাটফর্ম। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দেহগুলো। চিৎকারে চিৎকারে প্রকম্পিত পুলিশ কন্ট্রোল রুমের অভ্যন্তর, সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের পশ্চিম-উত্তর প্রান্ত। যে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতা, আত্মসমর্পণ করেছিল পাক সেনারা। বাঙালি বড় দুর্ভাগা জাতি। স্বাধীনতা স্তম্ভের পাশেই চলতে থাকে কোমলমতি ছাত্রদের ওপর এমন অমানবিক নির্যাতন, অত্যাচার।

কিছুক্ষণ বিরতি। তখন প্রায় মাঝরাত্রি। সবাইকে ডেকে বসানো হলো পুলিশ ব্যারাকের সামনে খোলা মাঠে। একে একে পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুরু করলেন সদ্যলাঠিপেটা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে, 'বাবা অনেক কষ্ট করে টাকা পাঠায় লেখাপড়া করার জন্য-রাস্তায় নেমে শ্লোগান দেবার জন্য নয়। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের গাছের আড়ালে বসে প্রেম করার জন্য নয়। আজকে উচিত শিক্ষা দেয়া হবে। যেন চিরজীবন তোমাদের মনে থাকে। এলেন তৎকালীন বড় সামরিক কর্মকর্তা আবদুর রহমান সাহেব। ছাত্রদের দিকে তাকালেন কিছুক্ষণ, কিছু নির্দেশনা দিয়ে চলে গেলেন। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল ওয়ারলেস-এর কথোপকথন, কোন লাশ কোথায় পাঠানো হয়েছে। কোথায় চলছে তখনো ছাত্র ধরপাকড়। এসব নানান স্পষ্ট-অস্পষ্ট কথাবার্তা। মাঝে মাঝে চলছিল চড়-থাপ্পড়। বড় চুল ধরে টানা আর উপদেশ-নির্দেশ। এভাবেই রাত্রিযাপন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনের গ্রেফতার হওয়া অসংখ্য ছাত্রের। রাত শেষ হবার আগে গ্রেফতার হওয়া ছাত্রের সংখ্যাটা হাজার ছাড়িয়ে গেল। পুলিশ কন্ট্রোল রুমের আঙিনা ভরে উঠল বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অত্যাচার করে ধরে-আনা ছাত্রদের ভিড়ে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ :

বন্দী সব ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হল মিন্টু রোডে। সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত। ঘোষণা করা হল সামরিক আইনে বিচার করা হবে। প্রায় ১৮ ঘন্টা পার হয়ে গেছে কারও মুখে জোটেনি কোনো দানাপানি। সারাদিন বসিয়ে রেখে বিকেল ৪টার দিকে নিয়ে যাওয়া হল খাদ্যমন্ত্রী আবদুল মোমিন খানের সরকারি বাড়ির মাঠে। সারি বেঁধে মাঠে বসিয়ে আরেক দফা লাঠিপেটা করা। আরেক দল পুলিশ লবণ-পানির বালতি নিয়ে। শুনলাম ওইগুলো ব্যথা কমানোর দাওয়াই। সবারই দৃষ্টি কাড়ল পাঞ্জাবি গায়ে পবিত্র কোরআন শরীফ হাতে এক ছাত্র। যখনই পুলিশ লাঠি মারতে উদ্যত হয়, তখনই সে এগিয়ে দিচ্ছিল পবিত্র কোরআন শরীফ। অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার এক করুণ প্রচেষ্টা। সন্ধ্যা গড়াতেই ১০/১২ টি বিআরটিসির বাস। বাসে ওঠার নির্দেশ দেয়া হলো। যখনই ছাত্ররা বাসে উঠতে যাচ্ছে, তখনই আবার কিল-ঘুষি, চড়-থাপ্পড় আর সেইসাথে লাঠির আঘাত নিয়েই ছাত্রদের বাসে উঠতে। কিন্তু একি! এরা কি এতই নিষ্ঠুর! এতই নির্দয় প্রতিটি বাসে ঢুকানো ৮০/৯০ জন করে ছাত্র, এরপর বাসের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে দেয়া। খুব কাছে থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করছিল মৃত্যু-দূতকে। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের কত নিষ্পাপ ছাত্রের সাথে সেদিনের নির্দয় সামরিক শাসনের বর্বরতার নিষ্ঠুর চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

গাড়িগুলো বেরিয়ে রাস্তায়। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে সামরিক সাঁজোয়া বহর। শেরাটনের পাশ দিয়ে ময়মনসিংহ সড়ক ধরে

এগিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু একি! রাস্তায় আলো নেই অন্ধকার, লোকজন নেই, বুঝলাম সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে। ভয়ে ভয়ে কেউ জানতে চাইছিল কোথায় নেয়া হচ্ছে। গেটে পাহারারত পুলিশের সদম্ভ উত্তর, 'রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গুলি করা হবে, নয়ত জাহাজে তুলে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেয়া হবে।' কেউ কেউ পুলিশের নিষ্ঠুর রসিকতাকে বিশ্বাসও করেছিল, কেঁদে উঠেছিল সজোরে।

কিন্তু না গাড়িগুলো থামল বনানী রেলগেটের অনতিদূরে আর্মি ট্রানজিট ক্যাম্পের কাছে। এক এক করে নামানো হলো সবাইকে। আবারও সেই কিল, ঘুষি আর লাঠির আপ্যায়নে। বলা হলো কিছুটা হেঁটে কিছুটা ফ্রগ জাম্প দিয়ে লাঠি হাতে দাঁড়ানো অসংখ্য পুলিশের মাঝ দিয়ে ঢুকতে হবে ঐ দালানগুলোতে। হাঁটতে ছন্দ নেইতো লাঠির আঘাত, ফ্রগজাম্প হচ্ছে না তো প্রচণ্ড জোরে ৬/৭ জনের বুটের লাথি আর লাঠির আঘাত। সিড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে গিয়ে দেখা প্রতিটি সিড়ির ভাজে দাঁড়ানো লাঠি হাতে পুলিশ। আরও দু'দশ ঘা দিয়ে দোতলা, তিনতলা ভর্তি হয়ে গেলো আহত অসংখ্য ছাত্রের অবসন্ন দেহে। সারারাত কেটে গেলো ওই অবসন্নতায়। মাঝ রাতে চরমভাবে আহতদের পানি আর ট্যাবলেট দেয়া হয়েছিল। ৩০ ঘণ্টা কেটে গেল অনাহারে, অনিদ্রায়-নির্যাতন আর বিভীষিকায়।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ :

দুঃস্বপ্ন, অবসাদ-উৎকণ্ঠায় ঘুম ভাঙে অনেকের। কেউ কেউ জেগে থাকে সারারাত দুশ্চিন্তায়। ডাক পড়ল মিলিটারি আর পুলিশের যৌথ ইন্টারোগেশন সেলে। একে একে সবারই ডাক পড়ল। কাউকে কাউকে ছেড়ে দেয়া হয় দুপুর দু'টা নাগাদ। আমরা রয়ে গেলাম অপর অংশে যাদেরকে ওরা মনে করেছিল ছাত্র নামে সামরিক শাসকদের শত্রু। প্রতিপক্ষ। মিছিল মিটিং-এর স্রষ্টা। তাদের পাঠিয়ে দেয়া ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। বলা যায় সামরিক ছাউনিতে ছাত্রদের অনুপ্রবেশ। দেহ তল্লাশি করে ঢুকানো হলো অনেকগুলো কয়েদির সেলে। একেকটি সেল ১২ ফুট বাই ১৬ ফুট হবে। দুইজন কয়েদির থাকার জন্য। সিমেন্টের বিছানা বালিসও দু'টি করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রতিবাদী ছাত্রদের-দুজনের রুমে থাকতে দেয়া ৪৮ জনকে। সিমেন্টের বিছানাতো দুঃস্বপ্ন। সহজে দাঁড়ানোরও স্থান নেই। একজন বসলে দাঁড়াতে হয় দু'জনকে। কয়েদখানাটির পিছনে ওপরের ভেন্টিলেটারটি বাথরুম থেকে মশাদের সহজ আগমনের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। সামনে লোহার গরাদটি ঢাকা কালো কম্বলে। ভেতরে অন্ধকারে আটকা ৪৮ জন ছাত্র। পাশে অন্য সেলগুলোতেও অন্যরাও আমাদের মতো এভাবেই। কেউ বা এফ রহমান, মহসীন, জহুরুল হক হলের আবার কেউ বা জগন্নাথ, সূর্যসেন হলের। এরা সবাই ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন-এর উত্তরসুরী, তিতুমীরের পরবর্তী প্রজন্ম।

স্বপন কুমার দাস, সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

এ মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না...

কাজী রওনাক হোসেন

মৃত্যু অবধারিত সত্য। কিন্তু এভাবে মৃত্যুর মিছিল মেনে নেওয়া যায় না। সড়ক দুর্ঘটনায় (হত্যায়) ঝরে যাচ্ছে একের পর এক প্রাণ, কিন্তু সেদিকে সরকার বা কারও কোনো চিন্তাই নেই। শনিবার ১৩ আগস্ট (আনলাকি থার্টিন সত্যি প্রমাণিত) দুপুরে মানিকগঞ্জ থেকে দাবানলের মতো সারা দেশে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল শোক সংবাদ। বাংলাদেশের দুই বন্ধু, দুই সৃষ্টিশীল শিল্পী মিশুক মুনীর ও তারেক মাসুদ সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই অকালমৃত্যু বরণ করেছেন। মিশুক আমার ছোটবেলার বন্ধু এবং আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সম্মান প্রথম ব্যাচের ছাত্র। তারেক মাসুদ আমাদের সমসাময়িক এবং ইতিহাস বিভাগের ছাত্র হিসেবে আমাদের বন্ধু ছিল। মিশুকের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল জুলাই মাসে তার শেষ কর্মস্থল এটিএন নিউজ অফিসে।

এই লেখা লিখতে বসে মনটা দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছে। বারবার স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো। আমরা প্রথম ব্যাচ অনার্সে মাত্র ১৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলাম। আমি, সুব্রত, মিশুক, শওকত মাহমুদ, আলী রীয়াজ, আনিস, সেলিম আহমেদ, মো. সেলিম, হারুন, তারেক, শেখ সাদেক, মির্জা তারেক, রাশিদা মহিউদ্দিন, নাসিম ফেরদৌস, রিনা সুলতানা ও মঞ্জু। আরেকজন মেয়ে সম্ভবত নাম রাবেয়া। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কম হওয়াতে আমরা সবাই যেন একটি পরিবার ছিলাম। মিশুক শুরু থেকেই আমাদের সবার চেয়ে একটু ভিন্ন ছিল। এলোমেলো লম্বা চুল, জিনসের প্যান্ট এবং কিছুটা ময়লা শার্টই ছিল তার নিত্যদিনের বেশভূষার অংশ। কিছুটা বোহেমিয়ান বললেও ভুল হবে না। ক্লাস খুব বেশি করত না। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় দেখা যেত ভালো রেজাল্ট। মিশুকের নামটি কে দিয়েছিল জানি না। সে নামটির সার্থক রূপায়ণ করতে পেরেছিল, কারণ সে ছিল অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, নিরহংকার এবং মিশুক প্রকৃতির। তার ভেতর কখনোই কোনো কপটতা ছিল না। বন্ধুর প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে কখনো তাকে পেছনে দেখা যায়নি। সবসময়ই সে ব্যস্ত থাকত নতুন কিছু সৃষ্টির প্রেরণায়। ক্যামেরা ছিল তার নিত্যসঙ্গী। এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতে সে ছিল সবসময়ই আগ্রহী। এ দেশে ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতায় তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনেকেই তাকে এ দেশের সায়মন ড্রিং বলত। ইটিভির শুরু থেকেই মিশুক যেভাবে 'গুড জার্নালিজম' করার প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, তা আজ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিষ্ঠিতরা অকপটে স্বীকার করে।

আজ আমার মনে পড়ছে আমরা জার্নালিজম বিভাগ থেকে প্রথম স্টাডি ট্যুরের আয়োজন করি। সেই ট্যুরে মিশুকও ছিল। ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে মিশুক কতটা প্রয়োজনীয় ও সহায়ক ছিল, তা শুধু তার সফরসঙ্গীরাই বলতে পারবে। আমাদের সফরসঙ্গী রিনা সুলতানা শাল কিনতে গিয়ে দিল্লিতে ট্রেন মিস করে। তখন মিশুক ও শওকত থেকে যায় রিনাকে নিয়ে আসার জন্য।

মিশুকের সঙ্গ সব সময়ই আনন্দদায়ক, কারণ আসর জমাতে ও আড্ডা দিতে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। আমাদের ১৮ জনের ভেতর ১ জন রাশিদা মহিউদ্দিন চলে গেছেন কয়েক বছর আগে। রাশিদা মহিউদ্দিন ইংরেজী সংবাদ পাঠিকা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতে রাজনীতিতে এবং সেখানেও সে জনপ্রিয় ছিল। মুক্তাগাছায় রাশিদা মহিউদ্দিন জনগণের সাথে এমনভাবে মিশেছিল যে এখনও সেখানে রাশিদার কথা বললে এলাকার মহিলাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বয়োবৃদ্ধরা নির্বাক হয়ে যান। ওর নিরহংকার পদচারণাই ওকে এই পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি বেঁচে থাকলে আজ সে অবশ্যই সংসদ সদস্য হত। অথচ নিয়তির নির্মম পরিহাস সামান্য দাঁত তুলতে যেয়ে ডাক্তারদের অবহেলায় তাকে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে হল।

এবার হারালাম মিশুককে। দুটিই অকালমৃত্যু এবং অপমৃত্যু। দাঁত তুলতে গিয়ে রাশিদার মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি মিশুক। আমরা কী করে মেনে নেব মিশুকের এই মৃত্যু! সদাহাস্য সেই মুখটি আজ নিথর নিস্তব্ধ। আর কখনো বলবে না– দোও.ও.স, কেমন আছিস? এটিএন নিউজের বার্তাকক্ষে আর কখনো বন্ধুপ্রতিম প্রধান নির্বাহীকে ছোটাছুটি করতে দেখবে না তার সহকর্মীরা। আমাদের আড্ডার মধ্যমণি হিসেবে আর কখনো পাব না মিশুককে। তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং সবার কাছে, বিশেষ করে সরকারের কাছে এই মিনতি করি, যেন বিপজ্জনক রাস্তাগুলো চিহ্নিত করে দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমাদের যেন আর অকালমৃত্যুর সংবাদ শুনতে না হয়।

কাজী রওনাক হোসেন, সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

কৃষি প্রতিবেদন রচনায় প্রযুক্তিজ্ঞান কতিপয় নমুনা বিশ্লেষণ

ড. তপন বাগচী

প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে উন্নয়ন প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে কৃষি একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কিন্তু কৃষি বিষয়টি এত জটিল ও প্রযুক্তিগত যে, এর ভেতরের বিষয় না জানা থাকলে প্রতিবেদন রচনা সম্ভবপর নয়। কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন রচনার কাঠামো কিংবা প্রকরণে আপাত কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও তথ্য-উৎস, তাৎক্ষণিকতা, ভাষা প্রয়োগ, প্রযুক্তিজ্ঞানের কারণে তা অন্য উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। কৃষি প্রতিবেদন রচনার জন্য ধান, পাট, গম, ইক্ষু, চা, মৎস্য, ফল, পশুসম্পদ, সেচ, বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হয়।

আমাদের অর্থনীতিতে এক বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছে কৃষি। এখানে কৃষি বলতে শস্য, ফল, পশু ও মৎস্যসম্পদকেও বোঝায়। জিডিপিতে এই কৃষির অবদান ২১.৯১ শতাংশ। এর মধ্যে কৃষিশস্যের অবদান অর্ধেকেরও বেশি (১২.১০ শতাংশ)। এর মধ্যে আবার ধানশস্যের অবদান সর্বাধিক (১০ শতাংশ) এবং সামগ্রিক বিচারে পুরো ফসলের ৮৩ শতাংশ। দেশের আবাদি জমির ৭৬ শতাংশ জমিতে ধানের আবাদ করা হয়। সামগ্রিক শ্রমশক্তির বিচারে কৃষিশ্রমশক্তির পরিমাণ ৫১.৬৯ শতাংশ। এই শ্রমশক্তির ৫৫ শতাংশ জুড়ে ধান। অর্থাৎ আমাদের কৃষি একান্তভাবেই ধান-ভিত্তিক কৃষি। আমরা কৃষি সাংবাদিকতা তথা কৃষিতথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার জন্য ধানশস্যকে বেছে নিতে চাই।

কৃষিতথ্য বিশেষত ধানবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য ধানের ক্ষেতই হতে পারে প্রধান তথ্য-উৎস। অর্থাৎ ক্ষেতের দিকে তাকিয়েই সাংবাদিক কে বুঝে নিতে হয় এবারে ধানের ফলন কি লক্ষ্যমাত্রা পেরোবে নাকি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে অর্থাৎ ফলন বেশি হলে এটি সংবাদ হিসেবে গণ্য হতে হবে। আবার ফলন কম হলেও তা নিয়ে সংবাদ তৈরি হতে পারে। কিন্তু প্রতিবেদকের জানা দরকার, কতটুকু জমিতে কতটুকু ফলন হয়। তার ব্যত্যয় ঘটলেই সংবাদের উপকরণ হতে পারে। এই উপকরণকে সংবাদ হিসেবে তৈরি করতে তখন আনুষঙ্গিক তথ্য জোগাড় করতে হয়। তার জন্য সাংবাদিকের কাছের উৎস হতে পারেন আশেপাশের কৃষক। স্থানীয় ব্লক সুপারভাইজার, কৃষি অফিস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের শাখা, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিকটতম শাখা, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কিংবা সার ও বীজের ডিলারদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাদের কাছে তথ্য আছে, কিন্তু কী তথ্য দরকার হবে, তা নির্ধারণ করা না গেলে একটি ভাল রিপোর্টও ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে আমাদের সামগ্রিক কৃষিতে।

উদাহরণ হিসেবে দৈনিক 'প্রথম আলো'র একটি সংবাদের নমুনা বিশ্লেষণ করা যাক। 'রাজশাহীতে এবার পারিজা ধানের ব্যাপক ফলন' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, 'রাজশাহী অঞ্চলে ...হাইব্রিড, উচ্চফলনশীল (উফশী) ও স্থানীয় জাতের মধ্যে পারিজা ধানের চাষাবাদই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বেশি ফলন পাওয়া যায় বলে কৃষকেরা দিনদিন এই ধানের আবাদে ঝুঁকে পড়ছেন।' ('রাজশাহীতে এবার পারিজা ধানের ব্যাপক ফলন, দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, তারিখ: ০৬-০৯-২০১০)

এই রিপোর্ট লিখতে গেলে হাইব্রিড, উচ্চফলনশীল (উফশী) এবং পারিজা ধান সম্পর্কে সামান্য হলেও জানতে হবে। পারিজা ধান 'হাইব্রিড' নয়, বাংলাদেশের উফশীও নয়। এটি ভারতের ইনব্রিড জাতের একটি ধান, যা বাংলাদেশ সরকারে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির অনুমোদন লাভ করেনি। এটি চোরাপথে বাংলাদেশে এসেছে। তা যে পথেই আসুক, এটি আমাদের দেশীয় জাত নয়, হাইব্রিডও নয়। তাই রিপোর্টের তথ্য ঠিক নয়। প্রযুক্তিগত ধারণার অভাবে অনেক ভালো তথ্যও খারাপ রিপোর্টে পরিণত হতে পারে, এই প্রতিবেদন থেকে তা বোঝা যায়। 'পারিজা' যে ভারতীয় জাত, তা কিন্তু রিপোর্টার জানেন, 'রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গতবার রাজশাহী অঞ্চলে যেখানে এক লাখ ৭১ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়েছিল, সেখানে এবার হয়েছে দুই লাখ ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে। এর মধ্যে ৭৭ হাজার হেক্টর জমিতেই আবাদ হয়েছে পারিজা ধানের। কৃষকেরাই প্রতিবেশী ভারতে উদ্ভাবিত এই জাতের ধান সংগ্রহ করেন।' তাহলে 'প্রতিবেশী ভারতে উদ্ভাবিত' জাতকে 'স্থানীয় জাত' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে যখন এই তথ্য জানা গেল, তখন প্রতিবেদক এবং বিভাগীয় সম্পাদক এখানে আরেকটু নজর দিতে পারতেন। একই প্রতিবেদনে আবার লেখা হয়েছে, 'কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কম সেচে ও অল্প সময়ের মধ্যে বেশি ফলন হয় বলে কৃষকদের এবার পারিজাসহ আউশ ধানের চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এতে তাঁরা ব্যাপকভাবে সাড়া দেন। বদৌলতে এবার রাজশাহীতে আউশ ধান চাষের পরিমাণ বেড়ে প্রায় দেড় গুণ বেশি হয়েছে।' এখানে মারাত্মক একটি তথ্য রয়েছে। 'পারিজা' জাতটি ভারতীয় এবং তা কৃষকেরা নিজের উদ্যোগে সংগ্রহ করেন। এর অনুমোদন নেই 'বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি'র। তাহলে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই জাত চাষে উদ্বুদ্ধ করে কোন অধিকার ও আইনের বলে? এ ব্যাপারে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির অভিমত ছাড়া এই রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ পত্রিকার জন্য দায়িত্বশীল কাজ। এর জন্য দরকার দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা। কেবল প্রতিবেদন-কৌশল জানলেই চলবে না, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হয় কৃষিপ্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান। প্রতিবেদকের পাশাপাশি বিভাগীয় সম্পাদককেও সজাগ থাকতে হয়। যথাপ্রযুক্ত শব্দ প্রয়োগ ছাড়া কৃষিপ্রতিবেদনে যথাযথ প্রকাশ করা যায় না। আর একজন সাংবাদিককে জানতে হয়, সরকারের কৃষি অফিস কী কী কাজ করে।

সরকারের ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে সরকারি ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাদে অন্যান্য দিন কৃষি বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। কোনো কারণে সেখানে তথ্য না পেলে তা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। অভিযোগ পাওয়ার পর তিনি পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অন্যথায় উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবহিত করা যাবে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য পাওয়া যাবে।

প্রত্যেক উপজেলায় ও জেলা দপ্তরে মাটির নমুনা পরীক্ষার জন্য সয়েল মিনিল্যাব সরবরাহ করা আছে। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের সহায়তায় মাটির নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা দপ্তরে প্রেরণ করলে মাটি পরীক্ষা করে ফসলের সার সুপারিশমালা প্রদান করা হয়। সেখান থেকেও তথ্য পাওয়া যায়।

বন্যায়/অতিবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন প্রেরণ করার দায়িত্ব স্থানীয় অফিসের। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের তালিকা তারা প্রণয়ন করে। কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ (সার, বীজ/চারা) সংগ্রহ করা, তা ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষিদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যাবতীয় কাজ তদারকি করা হয়। সেখান থেকে খবরের উপকরণ বের করা যায় সহজেই।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'দাউদকান্দিতে হস্তচালিত ধানকাটা যন্ত্র প্রদর্শন' শিরোনামে সংবাদ পড়লে পাঠকের মনে প্রত্যাশা জাগবে, এই ধরনের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ধারণা জাগবে। কিন্তু রিপোর্টে তা নেই। 'প্রথম আলো'র দাউদকান্দি প্রতিনিধির পাঠানো রিপোর্টে আছে, 'দাউদকান্দি উপজেলার জয়বাংলা বাজার মাঠে সম্প্রতি হস্তচালিত ধানকাটা যন্ত্রের এক প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। ...এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিটেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এ এইচ ইকবাল আহমেদ ও উপপরিচালক মো. হাসান, দাউদকান্দি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তপনরঞ্জন মজুমদার ও উপসহকারী কর্মকর্তা জাবিউল্লাহ এবং কৃষক নূরনবী, আমির হোসেন ও সরদার মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন।' (দাউদকান্দিতে হস্তচালিত ধান কাটা যন্ত্র প্রদর্শন', দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, তারিখঃ ০৩-০১-২০১১) এটি হয়ে গেছে অনুষ্ঠানের সংবাদ। কিন্তু কৃষি যন্ত্রপাতির বিবরণ থাকলে একে কৃষি বিষয়ক রিপোর্ট করে তোলা যেত।

কৃষি প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। বুঝতে হয়, ফসলের মৌসুম অর্থাৎ কোন ফসল কোন মৌসুমে হয়, সে সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রাখতে হয়। আবহাওয়া এবং জলবায়ুর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। ধরুন, খরায় একটি এলাকায় ফসল নষ্টের আশঙ্কা নিয়ে প্রতিবেদন রচনার কথা ভাবলেন একজন প্রতিবেদক। এ ধরনের সংবাদ এমন নয় যে, এক্ষুণি প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু আবার এমন যদি হয় যে, তথ্য সংগ্রহ করতে করতে তিন-চারদিন লেগে গেল, এর মধ্যে বৃষ্টি এসে গেল। তাহলে ওই সংবাদের প্রকাশোপযোগিতা থাকে না। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সেচ। এ ধরনের বিষয় নিয়ে সংবাদ রচনার সময় অযথা সময়ক্ষেপণ করার সুযোগ নেই। তাতে একটি চমৎকার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে নিমিষেই। এই ধরনের প্রাকৃতিক সমস্যাভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকতার প্রতি জোর দিতে হয়। একটি মৌসুমে কখন বীজ বুনতে হয়, সেচ দিতে হয়, কখন কীটনাশক দিতে হয়, কখন সার দিতে হয়, কখন ফসল ঘরে তুলতে হয়- তা বিশদ করে জানতে হয়। অর্থাৎ সময়জ্ঞানটা খুবই জরুরি।

কৃষিপ্রতিবেদনে ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিক সচেতন থাকা দরকার। ভাষা কিংবা শব্দ প্রয়োগের একটু হেরফের হওয়ার কারণে একটি তথ্য ভুল অর্থ বয়ে আনতে পারে। 'ডুমুরিয়ায় 'বাংলামতি' ধান একরে হয়েছে ৭০ মণ' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে–

খুলনা অঞ্চলে ডুমুরিয়া উপজেলার কার্তিকডাঙ্গা বিলে প্রথমবারের মতো চাষ হওয়া বাসমতি সদৃশ 'বাংলামতি' ধান আনুষ্ঠানিকভাবে কাটা হয়েছে। ১৯ এপ্রিল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা আংশিক কাটা ধানের গড় করে জানিয়েছেন, একরে ৭০ মণ ফলেছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক এস এম আতিয়ার রহমান কার্তিকডাঙ্গা বিলে তাঁর চিংড়ি ঘেরে এক একর জমিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ব্রি-৫০ জাতের বাংলামতি ধান চাষ করেন। তিনি সুপার রাইস বাংলামতি ধান চাষ করে সফল হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানীদের দাবি, তাঁদের উদ্ভাবিত এ ধানের নাম বাংলামতি হলেও এটা গুণে-মানে ও স্বাদে বাসমতিরই নামান্তর। ধানচাষি আতিয়ার রহমান বলেন, 'বাংলামতি ধানের ফলন ব্রি-২৮ জাতের সমান হওয়ায় কৃষক ও কৃষিবিদেরা দারুণ উৎসাহিত হয়েছেন। আমি চাই আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ অঞ্চলের কৃষকেরা মূল্যবান বাংলামতি ধান চাষে এগিয়ে আসুক।' ওই ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শিখা রানী মণ্ডল জানান, কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে আতিয়ার রহমানের এক একর জমিতে ৭০ মণ বাংলামতি ধান হয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পঙ্কজ কান্তি মজুমদার বলেন, 'বাংলামতি ধানের ফলন দেখে আমি অভিভূত। কারণ অন্য ধানের তুলনায় এ ধানের দাম অনেক গুণ বেশি। চাষিরা মূল্যবান এ ধান চাষ করলে অনেক লাভবান হবেন।' ('ডুমুরিয়ায় বাংলামতি ধান একরে হয়েছে ৭০ মণ', দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, তারিখঃ ২৫-০৪-২০১০)

এখানে আমাদের আপত্তি 'সুপাররাইস' শব্দটি নিয়ে। এটি একেবারেই টেকনিক্যাল শব্দ। ফলন বেশি হয়েছে বলেই 'বাংলামতি'কে সুপাররাইস বলা যায় না। ফিলিপাইনে 'সুপাররাইস' জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। 'সুপার হাইব্রিড রাইস' নামেও একটি জাত আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো 'সুপাররাইস' নামের কোনো জাতের ধান নেই। তাই ওই প্রতিবেদনে এই শব্দটি যথাপ্রযুক্ত নয়। এমনকি বৈজ্ঞানিক সত্য নয় এমন একটি তথ্য এখানে প্রচার করা হয়েছে। এত গুলো টেকনিক্যাল শব্দের কথা। এবার সাহিত্যের শব্দের বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। 'নতুন ধানে হবে রে নবান্ন' নামের প্রতিবেদনে 'প্রথম আলো' লিখেছে, ''নতুন ধানে হবে রে নবান্ন'–এ কথা মাথায় রেখেই বগুড়া জেলার বিভিন্ন এলাকার চাষিরা আগাম রোপণ করা বোরো ধান কাটা শুরু করেছেন। এই ধান হাটে উঠতে শুরু করেছে। গত বছরের তুলনায় দাম এবার ভালো পেয়ে চাষিরাও খুশি।' ('নতুন ধানে হবে রে নবান্ন', দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, তারিখ: ২১-১১-২০১০)

আমাদের এবারের আপত্তি শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ নিয়ে। এটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'শরৎ'-এর চরণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কবিতাটি এমন–

জননী, তোমার শুভ আহ্বান
    গিয়েছে নিখিল ভুবনে-
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
    তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিকো তোমার-
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
    ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী, তোমার আহ্বান লিপি
    পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
        (শরৎ)

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন', আর আমাদের প্রতিবেদক লিখেছেন, 'নতুন ধানে হবে রে নবান্ন'। 'নূতন' হয়ে গেছে 'নতুন', 'ধান্যে' হয়ে গেছে 'ধানে', 'হবে' হয়ে গেছে 'হবে রে'। একটি জননন্দিত কবিতার এরকম বিকৃতি কখনো কাম্য নয়। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে অনেক প্রতিবেদন পাঠকের কাছে যথাযথ অর্থ বহন করে না।

কঁরতোয়ার চরে ধান কৃষকের মনে আশা' নামের আরেক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, 'সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় করতোয়া নদীর বুকে জেগে ওঠা চর নতুন আশার সঞ্চার করেছে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর কৃষকদের মধ্যে। ধু ধু বালুর চরটিতে এবারই প্রথম চাষ হয়েছে ইরি-বোরো ধান। গত বর্ষায় বিরাট এই চরটিতে প্রচুর পলি পড়ে। এক ফুটের মতো পলির স্তরে পার্শ্ববর্তী সাতবাড়িয়া, চরসাতবাড়িয়া, ঘাটিনা, চরঘাটিনা, লক্ষ্মীপুর, বড়লক্ষ্মীপুর ও গুচ্ছগ্রামের কৃষকেরা ধান চাষ করছেন। চর জুড়ে এখন সোনালি ধানের শীষ বাতাসে দোল খাচ্ছে।' ('তোয়ার চরে ধান কৃষকের মনে আশা', দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা,তারিখ: ০৯-০৫-২০১০)

'ইরি-বোরো ধান' শব্দটিও 'সোনার পাথরবাটি'র মতো। 'ইরি' একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নাম, আর 'বোরো' একটি মৌসুমের নাম। এরকম ভিন্নমুখী দুটি শব্দের সহযোগে গঠিত 'ইরি-বোরো' কোনো ধানের নাম হতে পারে না। প্রতিবেদক এখানে 'উচ্চফলনশীল বোরো ধান' বা 'উফশী ধান' বোঝাতে চেয়েছেন। প্রযুক্তিগত ধারণার অভাবে এ ধরনের প্রতিবেদন রচিত হয়। কিন্তু প্রতিবেদনের শুদ্ধতা রক্ষায় এই সকল প্রযুক্তিগত শব্দের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়।

একটি খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে একজন বা একদল মানুষ। কিন্তু একটি কৃষি সংবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে দেশের সকল মানুষ। কৃষিবিষয়ক একটি সংবাদ দেশের অবস্থারও বদল করতে পারে। একটা উদাহরণ দিই। উত্তরবঙ্গের মঙ্গা নিরসন করা হচ্ছে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ব্রিধান-৩৩ সরাসরি বপন করলে ১০৩ থেকে ১০৫ দিন এবং রোপণ করলে ১১৫ থেকে ১১৮ দিন সময় লাগে। আশ্বিন-কার্তিক মাসেই ধানের কাটা শেষ হয়ে যাবে। আর এ সময়েই মঙ্গা হয়। এই বিষয়টি প্রায় এক যুগ আগেই সকলের নজরে আনার চেষ্টার করেছিলেন ধানবিজ্ঞানী ড. ফরহাদ জামিল। তখন সরকার যদি এটি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব দিত, তাহলে অনেক আগেই মঙ্গার আপদ কেটে যেত। কিন্তু গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটি আমলে আনে এবং উত্তরবঙ্গের মঙ্গা নিরসনে এই জাতের ধান চাষের ওপর গুরুত্ব দেয়। আমাদেও সংবাদপত্রও পালন করে ইতিবাচক ভূমিকা। মানুষ সচেতন হয় এবং এই জাতের ধান চাষে উৎসাহী হয়। কৃষির তথ্যকে ভালোভাবে বুঝে এভাবে প্রকাশের মাধ্যমে সাংবাদিকরাও পারে দেশের কৃষির উন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখতে।

ড. তপন বাগচী: কবি-প্রাবন্ধিক-যোগাযোগবিদ। উপপরিচালক, গবেষণা-সংকলন-ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক, প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর।

Freedom of Press and Ethics of Journalism

Dr. M. Kamal Uddin Jasim

The terms Freedom of Press and Ethics of Journalism are interrelated and interdependent; one cannot be understood without the inherent essence of the other. So, if we want to have real meaning of freedom of press then we must shed light on the ethics of journalism. Many a times, we cannot distinguish and differentiate these two terms rather we overlap each other. Here, we have tried to explain the basic theme of both the terms first, and then efforts were made to discover the correlation between them within the limited time and space.

Each and every citizen of Bangladesh deserves to enjoy freedom of press as basic right. The fundamental rights being guaranteed by the fundamental law of the land with some limitations. No organ of the state can act in breaking of such rights. Article 7 (seven) of our constitution ensures that all powers of the state belong to the people. In Bangladesh democratic Government is exercising powers through the persons elected by the people and such a government claims their transparency and accountability. Thus, by such constitutional provisions every citizen of the country has the right to know about every step taken by the Government in details for transparency and accountability of the activities of the persons in the government. So, to ensure the freedom of press it is absolutely necessary to avoid the scope of personalized explanation.

It is true that much has been discussed and worked out in our country about freedom of press and right of access to information. Yet, more activities need to be performed to achieve the esteemed target. Recently, the concerned authority has submitted draft broadcasting policy to the Parliamentary Standing Committee although that was criticized by the concerned experts as well as stakeholders including the veteran journalists like Mr. Shaikh Shiraj of Channel I and Mr. Motiur Rahman Choudhury of Manab Jamin. Subsequently, the authority has given consent to have open consultation with the experts and even that will be received through the e-mail. Undoubtedly, it is a good sign which may originate the long cherished silver line in the horizon of freedom of press in Bangladesh.

So, attempt should be taken for amendment of the proposed draft policy and necessary amendment of the words and phrases of the present law in force which are inconsistent with the draft and creating hindrance to carry on the activities of press without apprehension for creating environment of a welfare and democratic country.

On the other hand, the ethics of journalism include a pledge to truthfulness, accuracy, wisdom, courage, justice, temperance, objectivity, impartiality and virtually public accountability. A journalist, while reporting on an event, must keep in mind these ethical principles and devote themselves to reporting only those matters which are based on fact and evidence. Good faith with the reader is very important. The news must be trustworthy. It should be unbiased and free of any twist or superfluous observations.

Ethics of journalism also include the principle of 'Limitation of Harm' that withholds certain details from the news report in support of which no significant evidence is available or which may jeopardize one's reputation in the society. To minimize harm ethical journalists should treat sources, subjects and colleagues as human beings deserving of respect. Frequently, news

of persons, children related to the report is being withheld for social or humanitarian reasons. Sometimes news-photos are being published in some of our newspapers bypassing the social and psychological limitations. The 'Code of Ethics' restricts a journalist to get involved in 'Yellow Journalism' that is unethical and unprofessional journalism. Sometimes some journalist takes money or other favors in kind from people to publish certain news or to distort some news keenly. This is a very terrible practice contrary to the ethics and principles of journalism.

Under no circumstances, the editor, news editor or the chief reporter should assign a journalist to an area to report an event about which the assigned has little or no knowledge or experience which is in fact prerequisite. Particularly in Bangladesh, often the news editor, out of favor or affection, assigns someone to certain beats that actually he does not deserve.

One of the most fundamental ethics of journalism is 'objectivity' which refers to fairness, disinterestedness, factuality, and non partisanship. Renowned sociologist Michael Schudson (1978) argues that "the belief in objectivity is a faith in 'facts', distrust in 'values', and a commitment to their segregation".

We believe that a journalist or reporter in order to achieve the standard of objective journalism needs to practice the investigative method of gathering information and facts behind the screen. It would be evident that often some news reporters collect information from their known sources ignoring the facts lying with the other side which may have become a victim of the situation which may jeopardize the ultimate goal. A reporter should take the time to unveil the genuine facts and figures. Investigative journalism can ensure justice to all the stakeholders.

An accountable journalist can contribute a lot to help a society or a nation to prosper. A medium, whether it is print or electronic, is supposed to be an unconventional court where people approach to look for justice. Journalists are the conscience of a social system. They must discharge their duties by following the code of ethics to put a social system into order through objective journalism.

The Society of Professional Journalists, one of the prominent forums of journalists in the United States, affirms regarding the code of ethics:

> *"Public enlightenment is the forerunner of justice and the foundation of democracy. The duty of the journalists is to further those ends by seeking truth and providing a fair and comprehensive account of events and issues. Conscientious journalists from all media and specialists strive to serve the public with thoroughness and honesty. Professional integrity is the cornerstone of a journalist's credibility".*

To conclude, we can reaffirm that freedom of speech, freedom of press, right to know and access to information is the features of an efficient democracy. Media's freedom, democracy and good governance are as inseparable as the human rights are. So a liberated media is essential for building a society with moral, ethical and democratic values that impact our society and culture mostly. If the Media can work generously in a democratic atmosphere, the society is benefited and civilization gets a height from such liberty.

In fine, let me recapitulate that the freedom of press does not imply unlimited and ocean wide autonomy of the journalists. Since the scope of rights widens the sense of responsibility as well. So, to discover the truth journalists should be honest, fair and courageous in gathering, reporting and interpreting information. Furthermore, it should be kept in their mind that the Journalists are accountable to their readers, listeners, viewers, observers and each other and eventually to the nation.

Dr. M. Kamal Uddin Jasim, Senior Vice President, Islami Bank, Bangladesh Ltd.